শোনপাংশু

বুদ্ধদেব বসু

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
কলকাতা ১২

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী—এরা শোণপাংশু।

সকলে। শোণপাংশু!

রবীন্দ্রনাথ : 'অচলায়তন', ৫

প্রথম খণ্ড

আজ আমাদের নতুন প্রিন্সিপাল, ডক্টর পার্বতীপ্রসাদ চৌধুরীকে আমরা অভ্যর্থনা দিলাম। আমরা মানে স্কুলের কার্যনির্বাহক সমিতি— আর অবশ্য মাষ্টারমশাইরা। অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হ'লো অশোক হল-এ ; সুন্দর হ'লো। হল-এর মাথার দিকে লম্বা টেবিলে কর্তাব্যক্তিরা ; ঠিক মাঝখানে কিষণদাস লীলারাম, স্কুলের প্রেসিডেণ্ট তিনি—তাঁর ডান দিকে সেক্রেটারি নিত্যানন্দ মজুমদার, আর বাঁ দিকে নতুন প্রিন্সিপাল। প্রেসিডেণ্টের বয়স সত্তর, দর্শন বিরল ; এর আগে দু-একটা বড়ো ব্যাপারেও তিনি আসেননি—এমনকি পয়লা বৈশাখে নববর্ষের উৎসবও বাদ দিয়েছিলেন—আজ অনেকদিন পর তাঁকে চোখে দেখতে পেয়ে আমরা সকলেই বেশ উৎসাহিত হয়েছি।

অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁদের মাইনে আটশো টাকা বা তদূর্ধ্বে, ঐ বড়ো টেবিলে তাঁদের সকলেরই জায়গা হয়েছে। সমিতির সভ্যেরাও সেখানেই, মোটের উপর জন-তিরিশেক বসেছেন লম্বা টেবিলের তিন দিক ঘিরে। অন্য দিকটাতে—আমাদের সুবিধের কথা ভেবে—কাউকে বসানো হয়নি। হল-এর বাকি অংশে, ছোটো-ছোটো টেবিলে চার কি পাঁচজন ক'রে, ছড়িয়ে-ছড়িয়ে বসেছি আমরা ভারত-বিদ্যাপীঠের প্রায় ষাটজন মাষ্টারমশাই। স্ত্রীদেরও নিমন্ত্রণ ছিলো, কিন্তু আমরা এখানে অনেকেই অবিবাহিত, বিবাহিতেরাও সকলে সস্ত্রীক আসেননি, মোটের উপর পনেরো জনের বেশি মহিলা ছিলেন না। সুভদ্রা দেবী ছিলেন অবশ্য, প্রেসিডেণ্টের তিনটে চেয়ার পরে, সেক্রেটারির স্ত্রীর পাশে তাঁর আসন ছিলো। শাদা চুলে, হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙে, তীক্ষ্ণ মুখশ্রীতে, চমৎকার দেখাচ্ছিলো তাঁকে।

বিদ্যাপীঠের মহিলা-শাখার নাম শ্রীমতী। 'শাখা' কথাটা ঠিক হ'লো না ; দুটো প্রতিষ্ঠানই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, শুধু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এক। বয়সে দু-বছরের ছোটো হ'লেও, শ্রীমতীরও আয়তন বা গৌরব কিছু কম নয়, সেখানেও শো-পাঁচেক ছাত্রী, ভারতের নানা অংশ থেকে মেয়েরা আসে, আর ভর্তি হ'তে পারলে যে যার ঠাকুরকে পুজো দেয়। দুটো বিদ্যালয়ের মধ্যে মাইল দুয়েক ব্যবধান। শুনেছি শ্রীমতীর ক্যাম্পাস আমাদেরটার চেয়েও বড়ো ও সুন্দর ; হ্রদ আছে, ফোয়ারা আছে, চাঁদের আলোয় পিকনিক করার জন্য নকল ও নিরাপদ গুহা পর্যন্ত। শুনেছি, কিন্তু চোখে দেখিনি ; কেননা কর্তৃপক্ষ ও ছাপ-মারা অভিভাবক ভিন্ন আর কোনো পুরুষের গেট পেরোবার হুকুম নেই।

শ্রীমতীর প্রিন্সিপাল সুভদ্রা দেবী ; তাঁর দক্ষতার খ্যাতি সকলের মুখে, খোদ সেক্রেটারি তাঁকে সমীহ ক'রে চলেন। বিদ্যাপীঠে এই নিয়ে তৃতীয় প্রিন্সিপাল এলেন, কিন্তু শ্রীমতীর জন্ম থেকেই সুভদ্রা দেবী আসীন সেখানে। আর বৃদ্ধ হ'য়েও তিনি এত সক্ষম যে ভগবান যতদিন তাঁকে কোলে না টানেন, তাঁর অপসারণের কোনো কথাই ওঠে না। বিদ্যাপীঠের তৃতীয় প্রিন্সিপালের অভ্যর্থনা-সভায় তাঁর যে নিমন্ত্রণ হবে তা ধ'রেই নেয়া যায় ; কিন্তু আমরা অল্পবয়স্ক অধ্যাপকেরা কেউ-কেউ একটু অবাক হয়েছিলাম শ্রীমতীর কোনো অধ্যাপিকাকে না-দেখে ; কিন্তু হল-এ ব'সেই শোনা গেলো যে শ্রীমতী আলাদা একটি অভ্যর্থনা দেবে প্রিন্সিপাল চৌধুরীকে। তাতেও আমরা কেউ-কেউ একটু অবাক হলাম।

তা মহিলাদের বিরলতা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হ'লো। সত্যিকার প্রীতি-অনুষ্ঠান যাকে বলে। নিক্তিমাপা পাংচুয়ালিটি এখানকার নিয়ম, সবাই আমরা মিনিট দশেক আগেই এসে বসেছি, কিন্তু—যেন আমাদের সুখী করার জন্যই, মন খুলে গালগল্প করার আর-একটু সুযোগ দেবার জন্যই—মাননীয়েরা পাঁচ মিনিট দেরি ক'রে

ঢুকলেন। ঊর্ধ্বতনকে দেখে উঠে দাঁড়াবার নিয়ম নেই এখানে, কিন্তু ব্যবহারে তা আছে—আর সত্যিও, উপরিওলা কাউকে দেখলেই উল্লম্ব এবং নতশির হবার স্বাভাবিক একটা ঝোঁকই আছে ভারতীয়দের, শ্বেতাঙ্গদের যেমন মহিলা দেখলে—নিয়ম ক'রে ঐ স্বাভাবিক বৃত্তি যে চেপে রাখা যায় না, তাও এখানে স্বীকৃত। প্রথমে ঢুকলেন প্রেসিডেণ্ট, তাঁর পিছনে সেক্রেটারি ও প্রিন্সিপাল; আর প্রেসিডেণ্টকে দেখামাত্র (শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর আসার স্থির ছিলো না) একসঙ্গে সকলেই উঠে দাঁড়ালো—বারো শো টাকার প্রোফেসররা পর্যন্ত—শুধু সুভদ্রা দেবী, তাঁর মুখ যেন মোমে-গড়া, স্থাণু হ'য়ে ব'সে রইলেন—মহিলা ব'লেও, আর তাঁর ব্যক্তিত্বের বলেও। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট কয়েক পা এগিয়ে এসেই শ্লেষ্মাজড়িত মোটা গলায় বললেন, 'বসুন—সবাই বসুন আপনারা—'; আর ঐ কথাটুকুতে স্পষ্ট একটা খুশির হাওয়া ব'য়ে গেলো সারা ঘরে। পরে, ছোকরা মাষ্টারদের মধ্যে বলাবলি হ'য়েছে এই নিয়ে: খুশি কেন? ও ছাড়া আর কী বলতে পারতেন লীলারামজী? 'সবাই দাঁড়িয়ে থাকুন', বা 'ডিগবাজি খান'—এমন কথা তো আর বলা সম্ভব ছিলো না তাঁর পক্ষে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার বন্ধুরা এখানে ভুল করেছেন একটু; প্রেসিডেণ্ট ও-কথা না-বললেও সবাই আমরা পরমুহূর্তেই ব'সে পড়তাম—অন্তত মাননীয়েরা 'আসন গ্রহণ' করা মাত্র, কথাটা মুখ ফুটে ব'লে বিশেষ একটু সৌজন্যের পরিচয় দিয়েছেন লীলারামজী, আর সৌজন্য সর্বদাই প্রীতিপ্রদ।

প্রসঙ্গত ব'লে রাখি যে ঐ একবার ছাড়া দ্বিতীয়বার কোনো কথা বলেননি প্রেসিডেণ্ট, তার কারণটা সকলেরই জানা ব'লে কেউ তাতে অবাকও হয়নি। এই কোটিপতি কয়লাখনির মালিক বহুদিন ধ'রে কানে কম শুনতে-শুনতে একেবারেই বধির হ'য়ে গেছেন সম্প্রতি, তাই সারাক্ষণ ব'সে থাকা আর মাঝে-মাঝে মুখের পেশীতে মৃদু ও সদয় হাসি

ফুটিয়ে তোলা ছাড়া আর-কিছুই করবার ছিলো না তাঁর। সেই মুখও, ঠিক সামনে একটা ফুলদানি ছিলো ব'লে, সব সময় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না আমরা, কিন্তু ঐ অস্পষ্টতাই যেন তাঁর মহিমা আরো বাড়িয়ে দিলে আমাদের মনে; কেউ-কেউ এক-আধটু সমালোচনা করলেও মোটের উপর বোঝা গেলো তিনি আজ এসে খুব ভালো করলেন, তাঁর দর্শনে মাষ্টার মহলের অনেক সংশয় নিরসন হয়েছে।

তবে আমাদের মধ্যে এমন সমালোচক দু-একজন আছেন যাঁরা পরে এ নিয়েও কথা কইতে ছাড়েননি। কেন, কালা ব'লে তো আর বোবা নন; উঠে দাঁড়িয়ে (বা বার্ধক্যের ওজুহাতে ব'সে-ব'সেই) দু-তিন মিনিট কথা বললে ক্ষতি ছিলো কী? বধিরতাটা এক রকমের সুবিধেই তাঁর; অন্যেরা যে-সব বাজে কথা বলেন তা শুনতে হয় না, ঠিক নিজের মনের কথাটি বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন। আর, আফট্রল, তিনি প্রেসিডেন্ট, তাঁর উপরে কেউ নেই বিদ্যাপীঠে বা শ্রীমতীতে, দুটোতে মিলিয়ে দানও করেছেন পাঁচ লক্ষ টাকা; তাঁর তো দরকার করে না কাউকে তোয়াক্কা ক'রে কথা বলার। যদি স্কুলের পরিচালনায় কোনো অংশগ্রহণের শক্তি বা ইচ্ছা আর তাঁর না থাকে, তাহ'লে পদত্যাগ করলেই পারেন।

আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই সমালোচনা শুনে রীতিমতো চমকেছিলাম। দেড় বছর চাকরি করছি বিদ্যাপীঠে—মাত্রই দেড় বছর—কিন্তু কী জানি কেন, কলকাতার বাইরে হ'লেও—বা বাইরে ব'লেই—স্থানটি ঘটনাবহুল; এইটুকু সময়ের মধ্যে অনেকের বিষয়েই অনেক কথা শুনতে হয়েছে, কিছু-কিছু দেখতেও হয়নি তা নয়। যা দেখেছি সে-বিষয়ে কিছু হয়তো বলতে হবে এর পরে; যা শুনেছি তার সব কথা লিখে শাদা কাগজ কালো করতে চাই না। কিন্তু এতদিনের মধ্যেও এ-রকম একটা কথা এর আগে কানে আসেনি আমার, আর তাও স্বয়ং প্রেসিডেন্টের বিষয়ে। 'পদত্যাগ করলেই

পারেন—' আজকের মতো একটি হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠানের পর, ভালো চা, মাখনের মতো নরম চিকেন আর চীজ-স্যাণ্ডুইচ, আর কলকাতার সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে এমনতর ফরমায়েশি সন্দেশ খাবার পর—মানে, সকলেরই যখন মন-মেজাজ বেশ ভালো থাকার কথা, তেমনি সময়ে এ-রকম একটা কথা শুধু বেসুরো নয়, প্রায় রুচিগর্হিত, পিছনে কিছু যুক্তি থাকলেও রুচিতে বেধে যাওয়া উচিত। অন্তত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তা-ই মনে হয়। আর এ-ক্ষেত্রে যুক্তিই বা কী থাকতে পারে? একটা স্কুলের প্রেসিডেণ্ট—তিনি তো আর হাতে-কলমে কোনো কাজ করেন না কখনো, সব সময় পলিসিতেও হস্তক্ষেপ করেন না, ইংলণ্ডের রানীর মতো তাঁর সব ক্ষমতা থেকেও কোনো ক্ষমতা নেই; আসল মূল্য তাঁর নামের; সুবিচার, সুশাসন, স্থায়িত্ব প্রভৃতি যে-সব ধারণার তিনি প্রতীক, সেই ধারণাটাই মূল্যবান। এই প্রতীকী মূল্য যে-কোনো প্রেসিডেণ্টের প্রাপ্য, কিন্তু লীলারামজীর বিষয়ে আরো কথা আছে। প্রথমত তিনি বৃদ্ধ ব'লেই মান্য; দ্বিতীয়ত—কিন্তু এটাই হয়তো প্রথম কথা– তাঁরই দানের ফলে এই স্কুলের অস্তিত্ব আর আমাদের জীবিকা সম্ভব হয়েছে; তাঁকে সম্মান করতে বাধ্য আমরা—অন্তত, আমার তো তা-ই মনে হয়। আর তাছাড়া মানুষ হিশেবেও শ্রদ্ধেয় তিনি, তাঁর কোম্পানি কখনো ইনকম-ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে ব'লে এই রটনাময় মুক্তিগ্রামেও গুজব রটেনি কখনো; তাঁর দানের তালিকায় তাঁর জন্মভূমি গুজরাটকে অনেক পিছনে ফেলে গেছে পশ্চিম বাংলা, কেননা, তাঁর মতে, 'আমরা যে দেশে উপার্জন করি সে-দেশেই বেশি খরচ করা উচিত, আর গুজরাটি ধনী অনেক আছেন কিন্তু বাঙালিদের এক হাতের আঙুলে গুনতে গেলেও তৃতীয় আঙুলে পৌঁছানো যায় না'; বাংলার উদ্বাস্তুরা, যারা আন্দামানে বা দণ্ডকারণ্যে কিছুতেই যেতে চাইছে না, তাদের পাঁচশো বিঘে ধানের জমি কিনে দিয়েছেন বীরভূম জেলায়; এ-গুলোকে

সৎকর্ম ব'লে মানতেই হবে। এদিকে আমাদের লাইব্রেরিতে বহু দান ক'রেও এখনো হাজার পাঁচেক সংস্কৃত ইংরেজি বাংলা গুজরাটি মরাঠি বই তাঁর বাড়িতে আছে—গান্ধী, তিলক, শ্রীঅরবিন্দের প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি সংস্করণ, 'Dawn' আর 'Young India'র পুরো বাঁধানো সেট, চেক অথবা হাঙ্গেরিয়ানের মতো গৌণ ভাষাতেও 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ। বছরখানেক আগে, যখন দু-হাজার বইয়ের একটি কিস্তি দান করলেন আমাদের লাইব্রেরিতে, আর আমাকে তার তদারক করতে আরো কয়েকজনের সঙ্গে যেতে হ'লো, আমি অবাক হয়েছিলাম তাঁর আলমারিতে শুধু 'ডিভাইন কমেডি'র বত্রিশটি ভিন্ন-ভিন্ন ইংরেজি অনুবাদ দেখে, আর তারই পাশে চল্লিশ ভল্যুমে গ্যেটের ডি ল্যুক্স সেট, ১৮৫৭-এ লণ্ডনে ছাপা। বয়স অল্প ব'লে, আর বই ভালোবাসি ব'লে, বেরিয়ে এসে এ-বিষয়ে একটু উচ্ছ্বসিতভাবেই কথা বলেছিলাম, মনে পড়ে।

এক বছর আগে—বা ছ-মাস আগেও—আমাদের প্রেসিডেণ্টের লাইব্রেরি বা চরিত্র বিষয়ে আমার মন্তব্যগুলো সশ্রদ্ধভাবেই শুনতো সবাই—অন্ততপক্ষে গম্ভীরভাবে। কারো মুখে কোনো সন্দেহজনক ছায়া বা রেখা দেখিনি। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ—বিশেষ একটি ঘটনার পর থেকেই হয়তো—সহকর্মীদের অনেকের মধ্যেই উল্টো সুর লক্ষ্য করছিলাম। লীলারামজীর কথা উঠলে, যুবকের উজ্জ্বল চোখও মাছের মতো হ'য়ে যায়, সুগঠিত সহাস্য ঠোঁটের কোণে তির্যক রেখা ফুটে ওঠে। একেবারে খোলাখুলিভাবে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু খুব বেশি না-ঘুরিয়ে এবং নৈর্ব্যক্তিকতার আচ্ছাদনে, মাঝে-মাঝে যা ইঙ্গিত করে তা বড্ড মন-খারাপ-করা। হ্যাঁ—নিশ্চয়ই, লীলারামজী মানুষ ভালো, তাঁর উদ্দেশ্যের সাধুতা বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে-টাকাটা সুপার-ট্যাক্সে নিয়েই নিতো, না-হয় সেটা দানই করেছেন, কিন্তু বেগতিক দেখলেও হাতে ধ'রে বিলিয়ে দিতে তো সবাই পারে না। অবশ্য

কিষণদাস লীলারামজীর কাছে পাঁচ-দশ লাখ টাকায় কী বা এসে যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার হীরের খনিতেও শেয়ার আছে তাঁর—অন্তত তা-ই তো বলে লোকেরা। ব্যাবসাতে অত বড়ো মাথা, অথচ অন্য সব ব্যাপারে কেমন ছেলেমানুষের মতো—একটু কি আর সেনিলিটিতেও না-ধরেছে এতদিনে—একবার ভেবে দেখলেন না পাঁচশো বিঘে জমিতে অত বড়ো উদ্বাস্তু-সমস্যার কী বা সমাধান হবে—বরং একটা সাইকলজিক্যাল সেট-ব্যাক হয় এ-সব ছোটো-ছোটো পলেস্তারায়—বরং এখন সকলেরই চেষ্টা করা উচিত যাতে বাঙালিরা বাংলার মায়া কাটিয়ে চ'লে যায় দণ্ডকারণ্যে বা আন্দামানে বা অন্য যে-কোনো জায়গায় ভারত-সরকার নির্দেশ দেন—একমাত্র তাতেই স্থায়ী সমাধান হবে, নিজেদের বাঙালির বদলে ভারতীয় ব'লে ভাবতে না-শিখলে কিছুতেই আমরা রক্ষা পাবো না। কিন্তু লীলারামজী, তাঁর সব সাধু অভিপ্রায় নিয়ে, ঠিক তার উল্টো দিকে দড়ি টানছেন না কি? আজকের দিনে আরো বেশি কুণো ও প্রাদেশিক হ'তে বাঙালিকে যিনি শেখাবেন, তাঁকে নির্ভয়ে বন্ধু ব'লে গ্রহণ করা কি সম্ভব? আর তাঁর এই বাঙালিপ্রীতি, তাও কি একটা বিলাসমাত্র নয়, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দর নামের প্রতি অন্ধ মোহ, যে-পরিজীর্ণ মোহ থেকে নিখিলভারত আজ স্বাস্থ্যকরভাবে মুক্ত ক'রে নিয়েছে নিজেকে? আজ তো প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে সিপাহি-বিদ্রোহেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত, আর বাংলার স্বদেশী আন্দোলন অবৈজ্ঞানিক বাবুগিরি মাত্র—

'প্রমাণ হ'য়ে গেছে?' এখানে আমি বাধা না-দিয়ে পারিনি, ইতিহাস বিষয়ে আমার অল্প যেটুকু জ্ঞান আছে তা মগজের মধ্যে চনচন ক'রে উঠেছে। কিন্তু আমার কথার কোনো জবাব না-দিয়ে কথাটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছেন বুদ্ধিমান সমালোচকেরা।

'হ্যাঁ—বিলাসমাত্র, তাঁর বই কেনাও তেমনি আর-এক বিলাস।

বই তো বিক্রি হয়? আর কিনতে হ'লে সবচেয়ে দরকার তো টাকারই? আর টাকার জোর থাকলে কি এমন উপদেষ্টারই অভাব হয়, যারা বাছা-বাছা ক্লাসিক্স-এর নাম ব'লে দেবে, বা খুঁজে-পেতে আনিয়েও দেবে বরোদা পুনা কলকাতা বম্বাই লণ্ডন নিউ ইয়র্ক থেকে? আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে যে অত বড়ো ব্যবসায়ী লোক দান্তের চল্লিশটি সংস্করণ পড়েছেন? কি একটিও পড়েছেন? কি গ্যেটের পাতা ওল্টাবারও সময় পেয়েছেন? না, ওটা শুধু এক রকমের অহমিকার তৃপ্তিসাধন, "কালচার" নামক এক রহস্যময় কিন্তু অর্থহীন ব্রতপালন করা—"আমরা যে শুধু কুলি ঠেঙিয়ে কোটিপতি হয়েছি তা ভেবো না, অন্য দিকও আছে আমাদের, সত্য শিব সুন্দরের কদর বুঝি!" তা যা-ই হোক, ভান ক'রে ভালো করলেও ভালো, লক্ষ টাকার মদ না-খেয়ে লক্ষ টাকার বই কেনাকে নিন্দে করা যায় না—বিশেষত বইগুলো যখন আমাদের এই স্কুলের লাইব্রেরিতেই আসছে ক্রমে-ক্রমে।'

'তাও তো একেবারে উৎকৃষ্ট বইগুলো এখনো হাতে রেখেছেন,' হঠাৎ ব'লে উঠলো আর-একজন—কে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, এখানে অনেকেই এক ধরনের কথা বলে—'সেগুলো যাবে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে, আমরা নাকি তার যোগ্য নই।'

'আর টাকা বোধহয় যাবে ধর্মধ্বজ আশ্রমগুলিতে?' এটা—আমার মনে আছে—বলেছিলো ফিলজফির বিপিন গাঙ্গুলি, ছোটো-ছোটো চোখ দুটি ছুঁচের মতো সরু ও তীক্ষ্ণ ক'রে তুলে। 'কলকাতা থেকে পণ্ডিত আনিয়ে নাকি উপনিষদ পড়া হচ্ছে এখন। বাড়ি থেকে বেরোনো হয় না বড়ো—ভাইপো যমুনাদাসই ব্যাবসা চালায়। তা ভাইপো যোগ্য হয়েছে, আস্তে-আস্তে তার হাতে সবই ছেড়ে দিলে পারেন তো কিষণদাস। বয়স হয়েছে—এখন তো ধর্মকর্মেরই সময়।'

এতদূর পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে এর আগে, কিন্তু 'পদত্যাগ

করলেই পারেন'—এ-কথাটা এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হ'তে আজই প্রথম শুনলাম আমি। শুনে ভালো লাগলো না, খুবই খারাপ লাগলো। আমি যদিও এখানে অল্পদিন মাত্র এসেছি, তবু আমি জোর ক'রেই বলবো যে বিদ্যাপীঠ ও শ্রীমতীর প্রেসিডেন্ট হবার নৈতিক অধিকার কিষণদাস লীলারামের যতটা আছে আর কারোরই ততটা নেই; যদি তিনি কোনো কাজ আর নাও করেন, ভালো মন্দ কিছুই না ছাখেন, একই সঙ্গে বধির, অন্ধ আর অথর্ব হয়ে যান, তবু নামত তাঁর 'কর্তৃত্ব' আমাদের সেই কারণেই মানতে হবে, যে-কারণে রানী ভিক্টোরিয়া 'হলদে দাঁতওলা বুড়ি' হবার পরেও, বহু বছর 'রাজত্ব' করেছিলেন।

কিন্তু কিষণদাসের কথা বড্ড বেশি ব'লে ফেললাম। হয়তো এতটা দরকার ছিলো না, কেননা এই কাহিনীতে কিষণদাসের অংশ অকিঞ্চিৎ-কর। এবার আমার চা-পার্টিতে ফিরে যাওয়া উচিত।

দুই

প্রেসিডেণ্ট বক্তৃতা করলেন না ব'লে অনুষ্ঠানে ত্রুটি হ'লো না। প্রচুর চা, প্রচুর খাদ্য ; স্কুলের স্টুয়ার্ড সার্থকনামা বিপুল সহায় তাঁর দু-জন সহকারীকে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে দেখাশোনা করলেন সকলের—আমাদের সকলের প্রিয় বশিষ্ঠমশাইকে পর-পর চারটে ডবল সাইজের পান্তুয়া না-খাইয়ে ছাড়লেন না, চায়ের বদলে ঠাণ্ডা ঘোলের সরবৎ এনে দিলেন তাঁকে। কেউ-কেউ চা সরবৎ দুটোই খেলো, পঞ্চমীর চাঁদের মতো কেকের টুকরোর প্রতি সুবিচার করার পর গলা ভেজাবার জন্য রসগোল্লা। কর্তৃপক্ষ যে দরাজ হাতে আমাদের খুশি করতে চাচ্ছেন, এ-বিষয়ে তখনকার মতো কোনো সন্দেহ থাকলো না কারো মনে। কথাবার্তার সতর্ক কিন্তু সজীব গুঞ্জন সারাক্ষণ শোনা গেলো, ধূমপায়ীরা হেলান দিয়ে সিগারেটও ধরালেন, কেননা এ-সব প্রীতি-অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের ধূমপান বিষয়ে কোনো বারণ নেই বিদ্যাপীঠে।

খাওয়া যখন প্রায় শেষ, বড়ো টেবিলে চামচে-পেয়ালার টুংটাং আওয়াজ হ'লো, আমরা চকিত হ'য়ে যথাস্থানে দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ করলাম। প্রথমে বলতে উঠলেন মজুমদার মশাই, আমাদের সেক্রেটারি। রোগা, লম্বা, গালভাঙা, গম্ভীর মানুষ, 'আধ্যাত্মিক' ধরনের চেহারা, কম হাসেন ব'লে তাঁর আকস্মিক হাসিকে ঈশ্বরের বিশেষ কোনো দয়ার মতো মনে হয়। বারো মাস বিলিতি কাপড়েই দেখা যায় তাঁকে, আজ হঠাৎ কোঁচানো ধুতি আর গিলে-করা পাঞ্জাবি পরেছেন, তাতে তাঁর দূরত্ব আর গাম্ভীর্য আরো বরং বেড়েই গিয়েছিলো। তিনি কি বলেন তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হলাম আমরা।

পাছে পরে ভুলে যাই, তাই এখানেই ব'লে রাখি যে বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারির পদটি ঠিক অন্যান্য স্কুলের মতো নয়। সাধারণত সেক্রেটারি

মানে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, বা তাঁর পুত্র বা উত্তরাধিকারী, যিনি শিক্ষকদের নিয়োগ অথবা বিয়োগ করেন, মাসে-মাসে এসে হিশেবপত্র দেখে যান, বেতনবৃদ্ধি বা অন্য কোনো সুবিধের জন্য শিক্ষকদের আবেদন করতে হয় যাঁর কাছে। কিন্তু বিদ্যাপীঠের ব্যবস্থা অন্য রকম। এখানে সেক্রেটারির সম্বন্ধ শুধু শিক্ষকদের সঙ্গে নয়, ছাত্রদের সঙ্গেও ; আর শিক্ষক ও ছাত্রদের বাইরে আর যারা স্কুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত—যেমন ডাক্তার, কেরানি, হস্টেলের ওয়ার্ডেনরা, তাদের মধ্যেও কেউ নেই যে সেক্রেটারির মনোযোগলাভে অনধিকারী। এমনকি দারোয়ান বেয়ারাদের ডেকেও তাদের সুখদুঃখের কথা মাঝে-মাঝে শোনেন তিনি, ক্যানটীনের রান্নাঘর যথোচিত পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে কিনা তারও পরিদর্শন করতে ভোলেন না। স্কুলের তুচ্ছতম থেকে উচ্চতম বিষয় পর্যন্ত তাঁর প্রহরী চক্ষু খোলা আছে সব সময়।

তিনি—মানে, নিত্যানন্দ মজুমদার, অন্য কেউ ঐ পদে থাকলে এতটা করতেন কিনা সন্দেহ। সকলের শ্রমশক্তি সমান নয়, বিবেকও সমান জাগ্রত নয়। মিস্টার মজুমদার ঝাড়গণ্ডা কয়লাখনির চার আনার মালিক ; বিত্ত প্রচুর, কিন্তু বাণিজ্যে রুচি নেই। যৌবনে পিতার ইচ্ছা অনুসারে আইন পরীক্ষা পাশ করেছিলেন—ব্যবসায়ীর নিজের বাড়ির মধ্যেই একজন আইনজ্ঞ থাকলে ভালো হয় ; কিন্তু কার্যত দেখা গেলো যে নিজেদের মামলাপত্র বাইরের উকিল-ব্যারিস্টারের হাতে দিলেই সুফলের সম্ভাবনা বেশি। কলকাতায় প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন, কিন্তু হাইকোর্টেও তাঁর মন বসলো না। উদ্যম প্রচুর, প্রতিভাও আছে, অথচ তার ব্যবহারের ক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছেন না, এই রকম অবস্থার মধ্যে তাঁরই কয়লাখনি এলাকায় ভারত-বিদ্যাপীঠ স্থাপনের প্রস্তাব উঠলো। এক প্রেরণার মুহূর্তে (একে প্রেরণা ছাড়া আর কি বলা যায়) হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো যে শিক্ষাই তাঁর জীবনের কর্ম। এগিয়ে এলেন একে সাহায্য করতে, গ'ড়ে তুলতে, 'এই মহৎ ব্রতে আত্ম-

সমর্পণ' করতে। সেই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত সে-সম্বন্ধ এতটুকু ঢিলে হয়নি, দিনে-দিনে বরং দৃঢ় হয়েছে। প্রিন্সিপালের বদল হলো কতবার—হয়তো আরো হবে—কিন্তু অন্য কোনো সেক্রেটারি কি ভাবা যায়?

স্কুলের প্রধান আপিশগুলি যে-বাড়িতে তার নাম নালন্দা। বিদ্যা-পীঠের হালচাল প্রশংসনীয়, কোথাও কোনো অযত্ন বা মালিন্য নেই, কিন্তু নালন্দার আসবাবপত্র একটু হয়তো জমকালোর দিকেই, কেননা সেখানে, প্রতি বছর সেশনের শুরুতে, অভিভাবকেরা আসেন ছেলেদের ভর্তি করতে, কেউ বা দু-হাজার মাইল দূর থেকে এরোপ্লেনে, কেউ বা পাটনা রাঁচি কলকাতা ইত্যাদি কাছকাছি জায়গা থেকে প্রকাণ্ড স্টুডিবেকার হাঁকিয়ে। প্রথম চোখে দেখে ধারণাটা ভালো হওয়া চাই তো। আর্টপেপারে ছাপা সচিত্র পুস্তিকা দেখে যা মনে হয়, বাস্তব তাকে ফাঁকি দিলে তো চলবে না। তাঁরা এসে ওঠেন অতিথিভবনে; ঠিক গ্র্যাণ্ড হোটেলের মতো না-হ'লেও সহনীয় রকম ব্যবস্থা সেখানে; বেয়ারাদের টুপিতে স্কুলের ক্রেস্ট ঝকঝক করছে পিতলে, দু-হাত তুলে 'ভদ্রলোকের মতো' নমস্কার করে তারা, অন্তত তিনটে ভাষায় কথা বলতে পারে। আর তাঁদের অপেক্ষা করার জন্য নালন্দার প্রশস্ত হলঘর পার্ক স্ট্রীটের অত্যাধুনিক আসবাবপত্রে সাজানো; সেখানে ব'সে দুই দিকে সারি-সারি আপিশের টেবিল চোখে পড়ে, অনেক কাজ হচ্ছে কিন্তু টুঁ শব্দটি নেই, নিঃশব্দ টাইপরাইটারে বেরিয়ে আসছে পরিচ্ছন্ন সুমুদ্রিত কাগজ, ফিশফিশের উপরে কেউ কথা বলছে না, টেলিফোন ক্রিং করা মাত্র তুলে নিচ্ছে। কার্পেট-পাতা লম্বা করিডর পেরিয়ে একেবারে অন্য প্রান্তে সেক্রেটারির ঘর; আয়নার মতো কালো-কাচ-বসানো মস্ত বাঁকা টেবিলে তিনি ব'সে আছেন, মাত্র অল্প কয়েকটা জরুরি কাগজপত্র ছায়া ফেলেছে সেই কালো কাচে, দেয়ালে তেলরঙে কপি-করানো গান্ধীজীর দণ্ডীযাত্রার ছবি একটি। অভি-

ভাবকরা একে-একে ঢোকেন সেই ঘরে, খুশি হ'য়ে বেরিয়ে আসেন, ছেলে ভর্তি করাতে না-পারলেও অখুশি হন না। পরের বছর, নির্দিষ্ট সময়ের ছ-মাস আগে থেকে, আবার চিঠিপত্র আসতে আরম্ভ করে। তা-ই শুনেছি আমি।

কিন্তু অভিভাবকদের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের তুষ্টিসাধন করাই মিস্টার মজুমদারের একমাত্র কাজ নয়। বা প্রধান কাজও নয়। সারা বছর সপ্তাহে ছ-দিন, বিকেল তুটো থেকে ছ-টা পর্যন্ত, অভ্রান্ত নিয়মে কাজ করেন তিনি। তুটোর আগে কখনো আসেন না তা নয়; ছ-টার পরে কখনো থাকেন না তাও নয়। ছুটির পরে বা ছুটির দিনেও মাঝে-মাঝে ক্যাম্পাসে দেখা যায় তাঁকে; তাও গাড়িতে নয়, পায়ে হেঁটে; রোগা ছিপছিপে শরীর নিয়ে কেমন নিঃশব্দে অলক্ষিতে হাঁটার কায়দা আয়ত্ত করেছেন তিনি; আর সেটাও হয়তো বিদ্যাপিঠের পক্ষে উপকারী।

কিন্তু এখানে তু-একটা অবান্তর বিষয়ের উল্লেখ করতে হচ্ছে।

আশ্চর্য এই যে নিত্যানন্দ মজুমদারের 'প্রেরণা' তাঁকে ফাঁকি দেয়নি; তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতার সদ্ব্যবহারের জন্য ঠিক এই রকম একটি প্রতিষ্ঠানেরই প্রয়োজন ছিলো। আইনজ্ঞ তিনি; আর সেই জ্ঞান নিরাপদে ও ব্যাপকভাবে কাজে খাটাবার এমন সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যেতো? বিদ্যাপীঠের (এবং শ্রীমতীর) সংহিতা প্রণয়ন ও পরিমার্জনা ক'রে অধিকাংশ সময় কাটে তাঁর; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিধি-বিধান—লিখিত ও অলিখিত তুই রকমেরই—সেগুলোর আবার অনবরত পরিবর্তন হচ্ছে, 'নয়তো আমরা অভিজ্ঞতা থেকে আর কী শিখলাম?' এর পিছনে—সবার মুখেই শুনেছি—বহু পরিশ্রম করেন মিস্টার মজুমদার; দেশ-বিদেশের স্কুল-কলেজের পুঁথিপত্র আনিয়ে রাত জেগে পড়েন, আর সাইকলজি আর শিক্ষাপদ্ধতির আনকোরা বই, দরকার হ'লেই কলকাতায় ছোটেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। আর

শুধু আইন-প্রণয়নেই নয়, তাকে কাজে খাটানোর ব্যাপারেও তাঁর উৎসাহের গল্প অনেক শোনা যায়।

ক্যাম্পাসের মধ্যে ছেলেদের সিগারেট খাওয়া বারণ। নিয়মটা ভালো, কিন্তু সেটাকে অক্ষরে-অক্ষরে প্রয়োগ করা কি সোজা! আমাদের এখানে সিনিয়র কেম্ব্রিজ আর ইণ্টারমীডিয়েট পর্যন্ত পড়ানো হয়, আঠারো থেকে কুড়ি বছর বয়সের ছেলে সত্তর-আশিজন থাকেই, তাদের কেউ কখনো সিগারেটে একটা টান দেবে না, সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কেমন ক'রে? এই তো মিস্টার মজুমদারই, নিঃশব্দে হেঁটে যেতে, কতবার কত ছেলেকে ধ'রে ফেলেছেন, শাসন করেছেন, 'সস্নেহ উপদেশ'ও দিয়েছেন—কিন্তু আবার হয়তো সাতদিন পরে সেই ছেলেকেই দেখলেন ধোঁয়ার নিশেন উড়িয়ে নিশ্চিন্তে চলেছে। আশ্চর্য—ঠিক তাঁর চোখেই পড়ে, আর কারো চোখে পড়ে না। ছাত্রদের ব্যবহারে কোনো ত্রুটি হয়েছে এমন অভিযোগ কোনো শিক্ষক কখনো করেন না, কিন্তু করেন না ব'লেই মজুমদার মশাইকে আরো সতর্ক হ'য়ে চলতে হয়। সন্ধেবেলা, কোনো গাছের তলায়, তিন-চারটি যুবক-প্রোফেসর গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন হয়তো, হঠাৎ সামনে একটা লম্বা ছায়া পড়লো, কেউ একজন অর্ধেক হাসি গিলে ফেললেন, অন্যেরা চকিত হ'য়ে তাকালো। 'এই যে, ভালো তো সবাই, অনেক-দিন পর দেখা হ'লো।' মিনিটখানেক পর বিদায় নিলেন সেক্রেটারি, কিন্তু তারপরে আর গল্প যেন জমলো না। আবার কোনো-কোনো দিন, ক্লাশের সময়, বইখাতা নিয়ে ক্লাশের দিকে চলেছেন প্রোফেসর, হঠাৎ দেখা গেলো করিডরের শেষ প্রান্তে মজুমদার মশাই আর-একজন প্রোফেসরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু অবাক লাগলো; এ-সময়ে তো তাঁর ক্যাম্পাসে থাকার কথা নয়, থাকলেও তাঁর নিজের ঘরে…এখানে কেন? দৈবাৎ এক-আধদিন নয়, মাঝে-মাঝেই এ-রকম দেখা গেছে, আমিও দেখেছি। কিন্তু এ থেকে যাঁরা বিশেষ-কোনো

সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চান আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই ; আমি বিশ্বাস করি না যে—

কিন্তু থাক এ-সব বাজে কথা। আমি পাকা লিখিয়ে নই, মাঝে-মাঝেই খেই হারিয়ে যাবে, পাঠক নিজগুণে মার্জনা করবেন। আর লেখক হবার দরকারও নেই আমার ; আমি একটা রিপোর্ট করছি মাত্র—তাও অসামান্য কোনো ঘটনা নয়, বাংলাদেশের পক্ষে গতানু-গতিকই বলা যায়।

সেক্রেটারি মিনিট দশেক মাত্র বললেন, কিন্তু ঐ সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করলেন চমৎকার। যা বললেন তা আমাদের কাছে নতুন নয় অবশ্য, নতুন প্রিন্সিপালও জানেন ব'লে ধ'রে নেয়া যায়, কিন্তু সৎকথা বার-বার শুনেও ক্লান্তি আসে না। বিদ্যাপীঠের ইতিহাস সংক্ষেপে আবৃত্তি করলেন তিনি; আবেগহীন কেজো গলায়, কোথাও একটু রং না-চড়িয়ে, জরুরি তথ্য একটিও বাদ না-দিয়ে। ইংলণ্ডের পাব্লিক-স্কুল ধরনের যে-ক'টি বিদ্যালয় আছে ভারতবর্ষে সেগুলি হয় পুরোপুরি বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত, নয়তো—ম্যানেজমেণ্ট ভারতীয়দের হাতে থাকলেও আড়াই হাজার টাকা মাইনে দিয়ে প্রিন্সিপাল আনানো হয় বিলেত থেকে। সে-সব জায়গায় পড়াশুনো ভালোই হয়, ভালো-ভালো ঘরের ছেলেরাই আসে, কর্মজীবনে যে-কোনো প্রতিযোগিতায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় তারা, কিন্তু—কিন্তু কী? কী একটা ছোট্ট অভাব ছিলো তাদের—এখনো হয়তো আছে—যা আমরা পূরণ করার চেষ্টা করছি এখানে? সে-সব স্কুল একেবারেই বিলেতি ছাঁচে ঢালাই করা; তাঁদের ভূগোলটা শুধু ভারতের, মনের যোগ ইংলণ্ডের সঙ্গে। ইংলণ্ডের যেটা মহৎ দিক তার প্রতি শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে কারো কাছে আমরা হার মানবো না, কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও জোর দিয়ে বলবো যে ইংলণ্ড-বাসীরা ইংরেজ এবং ভারতবাসীরা ভারতীয়। (এখানে বড়ো টেবিলে 'হিয়ার, হিয়ার!' ধ্বনি উঠলো; ছোটো-ছোটো হাততালি পড়লো এখানে-ওখানে।) আমাদের ছেলেরা ইংলণ্ডের আদর্শে পুরোপুরি মানুষ হ'তে পারে না। আমি কারো প্রতি কোনো কটাক্ষ করছি না, কিন্তু এমন যদি কোনো বিদ্যালয় থাকে যেখানে এখনো মহাত্মাজীকে ('মহাৎমা' উচ্চারণ করলেন) মিস্টার গান্ধী ব'লে উল্লেখ করা হয়,

সেখানে কি আমাদের সন্তানদের পাঠাতে পারবো আমরা? যেখানে নিজের দেশের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা জাগবে না, নিজের মাতৃভাষা ভালো ক'রে শিখবে না, ইংলণ্ডেরই মফস্বলবাসী হওয়া যেখানে উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা, সেই সব প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য বিষয়ে তাদের তর্কাতীত যোগ্যতা নিয়েও, কি আজকের দিনের ভারতের উপযোগী?

প্রয়োজন অনুভূত হ'লো এমন একটি বিদ্যালয়ের, যা শিক্ষা-ব্যবস্থার নৈপুণ্যে পুরোনো পাব্লিক স্কুলগুলির সমকক্ষ, অথচ আদর্শে ভারতীয়। আদর্শে ভারতীয়, ধ্যানে ভারতীয়, কিন্তু জ্ঞানে সার্বজনীন। অনুভূত হ'লো পশ্চিম বাংলার এই প্রান্তে, এই খনি, শ্রম আর বাণিজ্যের আবেষ্টনীতে। সেটা ভাগ্যের কথা বলবো। এই স্থানটি কলকাতার কলুষ থেকে দূরে, অথচ দূরত্ব এত বেশি নয় যে কলকাতার ভাবস্রোত বাসি না-হ'য়ে পৌঁছতে পারে না। স্বাস্থ্য ভালো, দৃশ্য সুন্দর, কোনো কোলাহল নেই, অথচ একশো বর্গমাইলের মধ্যে এমন অনেক পরিবার বাস করেন যাঁরা সন্তানদের সুশিক্ষা দিতে উৎসুক এবং সক্ষম। লক্ষ্মীর বরপুত্রেরাও বিরল নন এই অঞ্চলে। তাঁদেরই কয়েকজনের আনুকূল্যে কল্পনাটিকে বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হ'লো—আর এই প্রসঙ্গে যিনি সর্বাগ্রে স্মরণীয় তিনি আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট, আপনাদের সামনে উপবিষ্ট দানবীর শ্রী কিষণদাস লীলারামজী।

মুখ ফিরিয়ে লীলারামজীকে গভীর নতি জানালেন মজুমদার মশাই, ক্ষীণ হাততালি পড়লো, কিন্তু প্রেসিডেন্টের প্রশান্ত মুখে ভাবের কোনো পরিবর্তন হ'লো না। হয়তো কিছুই বুঝলেন না তিনি, কিংবা হয়তো অভিনন্দনে এতই অভ্যস্ত যে এতে আর মনে কোনো বিকার হয় না।

এর পরে সেক্রেটারি অল্প কথায় স্কুলের দ্রুত ও আশাতীত উন্নতির নকশা আঁকলেন; ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই তার আরম্ভ, সাহস ক'রে সেই সময়ে শ্রীমতীরও পত্তন করা হ'লো। আজ

বিদ্যাপীঠের তিন শো সীটের জন্য দু-হাজার অ্যাপ্লিকেশন পড়ে ভারতের নানা প্রদেশ থেকে ; শ্রীমতীতে অন্তত পক্ষে পনেরো শো। আজ ভারতে বিদ্যাপীঠের সঙ্গে তুলনীয় স্কুল ছেলেদের জন্য আর একটিও নেই এ-কথা বললে দাম্ভিকতা হবে আমাদের পক্ষে—অন্তত আমি বলবো যে বম্বাইয়ের জ্ঞানোদয় কোনো-কোনো বিষয়ে আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট। কিন্তু যদি বলি যে শ্রীমতীর মতো মহিলা-বিদ্যালয় ভারতে আর নেই, তা'হলে, স্বাভাবিক বিনয়বশত, শ্রীযুক্তা সুভদ্রা দেবী প্রতিবাদ করলেও আমরা মনে-মনে জানবো যে নিছক সত্য কথাই বলছি।

(এখানেও হাততালি দিলেন কয়েকজন, কিন্তু কেউ-কেউ চিন্তিত-ভাবে মাথা নিচু করলো। সুভদ্রা দেবীর দৃষ্টি একবার ঘুরে গেলো সারা হল-এ।)

'কিন্তু আজ—' এবার সেক্রেটারির মুখের কথাই উদ্ধৃত করছি, যতদূর মনে পড়ছে আমার—'আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি নিজেদের বিজ্ঞাপন দিতে নয়, আমাদের এই পরিবারের' (এখানে গোল ক'রে একবার শূন্যে হাতটি ঘুরিয়ে গেলেন তিনি) 'সদ্যসমাগত শ্রদ্ধেয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানাতে। শ্রীযুক্ত পার্বতীপ্রসাদ চৌধুরী খ্যাতিমান পুরুষ, তাঁর কৃতিত্বের কথা আপনারা সকলেই জানেন—' (এ-কথা শুনে আমরা অনেকেই অবাক হয়েছিলাম ; কেননা অস্পষ্ট-ভাবে পার্বতীপ্রসাদের নাম শুনেছিলাম ব'লেই তাঁর খ্যাতির যথার্থ কারণটা জানবার জন্য আরো বেশি আগ্রহ ছিলো আমাদের) '—ক্রমশ আরো বেশি পরিচয় পাবেন তাঁর। সম্প্রতি আমাদের এই সংসার একটু...একটু অগোছালো হ'য়ে পড়েছিলো ; আমাদের নতুন অধ্যক্ষের সহৃদয় প্রযত্নে সেই ত্রুটি সংশোধিত হ'তে আশা করছি দেরি হবে না। আমাদের এই বিদ্যালয়ের দ্বার জাতিধর্মবর্ণগোষ্ঠীনির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ; আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান

খৃষ্টান শিখ জৈন জরথুস্ত্রীয় সকলেই আছেন, প্রত্যহ সকালে মিলন-মণ্ডপে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে এক-একটি অংশের পাঠ ও ব্যাখ্যা হ'য়ে থাকে ; রাজনীতিকে বিদ্যালয় থেকে দূরে রাখা উচিত তা বিশ্বাস ক'রেও সব রকম রাজনৈতিক মত সশ্রদ্ধভাবে শুনে থাকি আমরা, কেউ নিজেকে নাস্তিক ব'লে ঘোষণা করলেও আপত্তি করি না। "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির"—"Where the mind is without fear and knowledge is free"—এই হ'লো আমাদের ···আমাদের মটো···মানে, মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রের অর্থ কী, তা উপস্থিত সুধীবৃন্দের কাছে, বিশেষত শ্রীযুক্ত চৌধুরীর মতো পণ্ডিতের কাছে, বুঝিয়ে বলার চেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হবে।

'শুধু একটা বিষয়ে সাবধান থাকতে হয় আমাদের ; বিদ্যাপীঠের আদর্শ যাতে কোনোরকমে ক্ষুণ্ণ না হয়, মলিন না হয়, বিকৃত না হয়। আধুনিকতার নামে, স্বাধীন চিন্তার নামে, এমনকি শিক্ষাতন্ত্রের উন্নতির ওজুহাতেও, ঐ আদর্শকে বিপন্ন হ'তে দেবো না আমরা, দিতে পারি না। যদি কোনো দিক থেকে কোনো বিপদ কখনো দেখা দেয়, বা কোনো বিগত বিপদের ভগ্নাংশ এখনো অবশিষ্ট থাকে, তার নিরাকরণের জন্য আজ থেকে আমরা সবচেয়ে বেশি নির্ভর করবো যাঁর উপর, যাঁর বুদ্ধি, সুবিচারবোধ ও হিতৈষণা দুর্বলকে স্খলন থেকে রক্ষা করবে, সেই ডক্টর পার্বতীপ্রসাদ চৌধুরীকে আপনাদের সকলের মুখপাত্র হিশেবে, আজ আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাই। এই বিদ্যাপীঠ দীর্ঘকাল তাঁর বাসভূমি হোক!'

তিনি শেষ করামাত্র দুই প্রকাণ্ড হাতে, দু-এক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে-দিয়ে, তিনবার করতালি দিলেন লীলারামজী, হল-এ তার প্রতিধ্বনি উঠলো। উঠে দাঁড়িয়ে, শ্রোতাদের একটি ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে আবার ব'সে পড়লেন মজুমদার মশাই। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সুভদ্রা দেবী উঠলেন।

মুক্তিগ্রামে—এমনকি এই বর্ধিষ্ণু জেলার সর্বত্র—সুভদ্রা দেবীর খ্যাতি একটা প্রবাদের মতো। এখানে এসে অবধি তাঁর গুণপনার কথা এত শুনেছি যে পাঠকের অবগতির জন্য তার চুম্বক না-লিখে পারছি না। তাঁর বাবা ছিলেন উনিশ শতকের বিখ্যাত ডাক্তার রাঘবেন্দ্র ঘোষাল, যিনি এডিনবরা থেকে ভিয়েনা, আবার ভিয়েনা থেকে শিকাগোতে গিয়েছিলেন অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণার তাড়নায়, পঁচিশ বছর ধ'রে দুর্দান্ত ডাক্তারি করার পর যিনি হঠাৎ বেদান্ত পড়া শুরু করেন, আর তারপর সারা জীবনের অর্জিত জ্ঞান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি ধরেন, আর তাইতেই এতদূর পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করেন যে তাঁর সম্বন্ধে গল্প ছিলো যে রাঘব বুড়ো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে রোগীকে আবছা এক পলক দেখেই ফিরে চ'লে যান, কেননা 'ও-ব্যাটাকে যমে ধরেছে', আবার নাভিশ্বাস-ওঠা মুমূর্ষুকে ফিরিয়ে আনেন তাঁর এক-একটি পরাক্রান্ত জলবিন্দুতে। সেই রাঘবেন্দ্রের কন্যা সুভদ্রা যখন ১৯১০ সালে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করলেন, আত্মীয়রা সবাই বললে যে মেয়েকে আর পড়াশুনো করিয়ে কাজ নেই, কেননা 'বরের তো কনের চাইতে বেশি বিদ্বান হওয়া দরকার, আর কনে যদি এম. এ. পর্যন্ত পাশ ক'রে ফ্যালে তাহ'লে আর বেশি বিদ্বান জুটবে কোত্থেকে।' কিন্তু রাঘবেন্দ্র হুংকার দিয়ে বললেন, 'কুছ্ পরোয়া নেই, মেয়ের বিয়ে না হয় তো না-ই হবে!' এম. এ. পড়ালেন মেয়েকে, সগৌরবে পাশ করলেন সুভদ্রা দেবী, কত রকম পদকে আর পুরস্কারে যে ভূষিত হলেন তার ইয়ত্তা নেই। মায়ের ইচ্ছে, মেয়ে এবার ভালো ঘরে-বরে পড়ুক; কিন্তু নানা দিকে ঘটক পাঠিয়ে দেখা গেলো যে বাপের মুখের কথাটা হয়তো বা ভবিষ্যদ্বাণী

হ'য়ে উঠবে। সুভদ্রা ঘোষালের বিরাট বিদ্যাবত্তা সত্যিই যেন সদ্বংশজাত উপযুক্ত ব্রাহ্মণতনয়দের হঠিয়ে রাখছে, এই রকম মনে হ'তে লাগলো। যে শোনে সে-ই নাকি 'ওরে বাবা!' ব'লে ওঠে—ছেলের বাবারা সুদ্ধু। 'আর অতগুলো যখন পাশ দিয়েছে, বয়স কোন না ছত্রিশ!' কন্যার বিদ্যা এবং বয়সের ভার কাঞ্চনের দ্বারা প্রশমিত হ'লে কোনো-কোনো উদার পরিবার ভেবে দেখতে হয়তো রাজি ছিলেন, কিন্তু রাঘবেন্দ্রের ঐ আর-এক জেদ, আধ-পয়সা বরপণ দেবেন না, আর মেয়েকে কী দেবেন বা না দেবেন 'তা তুমি আমাকে ব'লে দেবার কে হে, বাপু—সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার!'

পরের বছর মেয়েকে তিনি বিলেতে পাঠিয়ে দিলেন। সুভদ্রা ঘোষাল লীডসে এম. এড. নিলেন, লণ্ডনে পি এইচ. ডি.। গ্লাসগোতে একটা মেয়েদের কলেজে শিক্ষকতাও করলেন কিছুদিন। ইংলণ্ডে নানা মহলে তাঁর সমাদর হ'লো—শুধু মেধার জন্য নয়, রূপের জন্যও। এখনো, এই সুপ্রাচীন অবস্থায় দেখেও, অনুমান করা শক্ত হয় না যে চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কী-রকম আগুন তিনি নিজের অজান্তেই বিকিরণ করতেন। দীর্ঘাঙ্গী, পদ্মবর্ণা, আরব রমণীর মতো তীক্ষ্ণ টানা চোখে যেন মরুভূমি ঝিলিক দিচ্ছে। কিন্তু সে-আগুনে দীপ্তি যতটা, শৈত্য ছিলো ততোধিক। তা-ই গল্প শুনেছি তাঁর বিষয়ে। কথিত আছে, তাঁর প্রবাসকালে একাধিক শ্বেতাঙ্গ যুবক তাঁর পাণি-প্রার্থী হয়েছিলো, কিন্তু তিনি তাদের দিকে এমন এক-একটি দৃষ্টি হেনেছিলেন যে নেহাৎই বাপকা-ব্যাটা ইংরেজের বাচ্চা ব'লে তৎক্ষণাৎ বরফ হ'য়ে জ'মে যায়নি তারা, আমাদের মতো বাংলা-মায়ের দুলাল হ'লে হয়তো পায়ে প'ড়ে 'মাসিমা' ব'লেই ডুকরে উঠতো। অবশ্য তাঁর স্বদেশীয় কোনো যুবক ও-রকম দুঃসাহসের পরিচয় দেয়নি কখনো, প্রথম থেকেই শ্রদ্ধার প্রাচুর্যে যথোচিত দূরে রেখেছে তাঁকে; আর তারই ফলে, স্বভাবতই, পুরুষের প্রতি, বিবাহের প্রতি, তৎসংক্রান্ত

সমস্ত ব্যাপারের প্রতি এমন একটি বিতৃষ্ণা জমা হ'তে লাগলো তাঁর মনে যা ক্রমে দানা বেঁধে তাঁকে ক'রে তুললে কর্মজীবনে একেবারেই পুরুষের সমকক্ষ, বা পুরুষের চেয়েও আরো বেশি সক্ষম।

আটাশ বছর বয়সে দেশে ফিরে তিনি বাংলা-মুখো আর হলেন না, কর্ম নিলেন লখনৌয়ের লেডি ভরদ্বাজ উইমেন্স কলেজে। সাত বছর পরে, বহু প্রবীণতর অধ্যাপিকাকে ডিঙিয়ে, প্রিন্সিপাল হলেন; সারা উত্তর ভারতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো একজন 'আইডিএল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' হিশেবে। আরো অনেক অর্থকরী কর্মের আহ্বান এসেছে তাঁর কাছে; দ্বিতীয় বার চিন্তা না-ক'রে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমন্ত্রণ পেয়েছেন অনেক বড়ো-বড়ো কমিটির সভ্য হ'তে, এমনকি কোনো-এক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সেনেটের সদস্য করতে চেয়েছিলো; —নেননি। এই ভরদ্বাজ কলেজই তাঁর জীবন; এর বাইরে কোথাও যেতে চান না, কিছুই করতে চান না। অবশেষে, যখন আইনত তাঁর অবসর নেবার তারিখ তিন বছর পেরিয়ে গেছে, তখন শ্রীমতীর স্থাপনার সূচনায় তাঁর কাছে গিয়ে একেবারে ধন্না দিয়ে পড়লেন সস্ত্রীক মিস্টার মজুমদার। লখনৌতে তাঁর বিদায়সভায় দু-হাজার লোকের নিমন্ত্রণ হ'লো; ভরদ্বাজ কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁকে উপহার দিলেন—একজাক্টা ঘড়ি, লাইফটাইম পার্কার, রুপোর মানপত্র, চন্দনকাঠের টেবলল্যাম্প, এই সব বিবিধ ও গতানুগতিক সামগ্রী ছাড়াও—সত্যিকার সোনার পাতে বাঁধানো এক খণ্ড তাঁর প্রিয় পুঁথি—অ্যাবট-প্রণীত নেপোলিয়নের জীবন-চরিত। শোনা যায়, এই শেষের উপহারটি তাঁকে দিয়েছিলো তাঁর প্রিয় ছাত্রীরা, আর তার সামনের পাতায় ছোট্ট ক'রে লেখা ছিলো এই ক-টি লাইন;

'How far is St. Helena from sovereignty at school?'
I had not time to answer then—the classes came so fast,
And such a fight it was to teach the Great Grammatic Rule!
(But if you take the first step, you will take the last!)'

—কিন্তু, আমার সহকর্মীদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি—এর সব কথা বিশ্বাস করা শক্ত। প্রথমত, জগতে এত বই থাকতে অ্যাবটের নেপোলিয়ন-জীবনী উপহার দেয়া হবে কেন সুভদ্রা দেবীকে (ও-বই এখন আর ছাপা হয় কিনা সেটাই সন্দেহ করা যায়), আর দ্বিতীয়ত—তাঁর ‘প্রিয় ছাত্রীরা’ ও-রকম একটা বাজে রসিকতাই বা করবে কেন তাঁর মতো মাননীয়া মহিলার সঙ্গে? কেন, বাজে রসিকতা কেন, (উত্তরে শুনতে হয়েছে আমাকে) বেশ ভালো তো—ওটাকে ঠিক রসিকতা হিশেবে না-নিলেও চলতে পারে, তথ্য হিশেবে গ্রহণ করতেও দোষ নেই। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে সুভদ্রা দেবী বারো থেকে আঠারো বছরের মধ্যে আট বার অ্যাবটের নেপোলিয়ন জীবনী ‘আদ্যন্ত’ পড়েছিলেন; ও-বই, এবং নেপোলিয়নের চরিত্র, প্রভূতভাবে অভিভূত করে তাঁকে, সারা জীবন তাঁর গোপন বীরোপাসনা ঐ দিগ্বিজয়ীর দিকে ধাবিত হয়েছে অনবরত। আঠারো পেরিয়ে, পরীক্ষা পাশের প্রয়োজনে ছাড়া আর-কোনো বই নাকি পড়েননি, তবে বিলেতে গিয়ে সদ্যোদিত কিপলিঙের রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে তাঁর—এবং তখনই তিনি মনে-মনে স্থির ক'রে নেন যে ইংরেজি সাহিত্য রাডিয়ার্ড কিপলিঙেই পরিসমাপ্ত। কিপলিঙের অনেক কবিতা (‘almost as great as Tennyson’s’), আর অ্যাবটের বড়ো-বড়ো অনুচ্ছেদ, এই সত্তর বছর বয়সেও কণ্ঠস্থ আছে তাঁর; বছরের পর বছর, মেয়েদের যা-কিছু লিখতে দেন তার মধ্যে ঐ দুটি ভাণ্ডার থেকেই প্রচুরতম উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। এক মাস তাঁর ক্লাশ ক'রেই নতুন মেয়েরা জেনে যায় যে নেপোলিয়ন জগতের প্রধানতম মহাপুরুষ, কিপলিং প্রধানতম মহাকবি, আর মানবজীবনের প্রধানতম শিক্ষণীয় বিষয় ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ। ঐ নাকি আর-এক ধ্যান তাঁর জীবনের, ইংরেজি ব্যাকরণ, বি. এ. ক্লাশ পর্যন্ত তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইন-কানুন কুরে-কুরে ঢুকিয়ে দেন ছাত্রীদের মগজে;

সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, যা-ই পড়ান না (আর প্রায় যে-কোনো বিষয় তিনি একই রকম সাবলীলভাবে পড়াতে পারেন ব'লে বিপুল একটি প্রবচন আছে), তাকেই ক'রে তোলেন ব্যাকরণশিক্ষার একটা উপায়; তাঁর কাছে বছরখানেক পড়লে স্বল্পবুদ্ধি ছাত্রীও না-জেনে পারবে না যে 'There are heaps of tea' বলাটা মহাপাপ, বা 'I would like' কথাটা স্কচ, আইরিশ, আমেরিকান ও ভারতীয়দের মধ্যে স্বচ্ছন্দে প্রচলিত থাকলেও 'রাজার ইংরেজি' সযত্নে ওটাকে পরিহার ক'রে। হ্যাঁ—জানবে সবই—কোন-কোন অবস্থায় ক্রিয়া-পদের আগে 'to' বসবে আর কোন-কোন ক্ষেত্রে তার পরে '-ing', তারও উদাহরণ আওড়াতে পারবে মুখে-মুখে, 'স্বাধীন রচনার সময় ব্যবহার করতে পারুক আর না-ই পারুক।' অতএব 'দেখছেন তো, ঐ চার লাইন পদ্যে এক ঢিলে তিন পাখি মারা হয়েছিলো: কিপলিঙের প্যারডি ক'রেই সুভদ্রা দেবীর প্রিয় কবিকে সম্মান জানিয়েছিলো ছাত্রীরা. কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছিলো ব্যাকরণ-শিক্ষাদানে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব—এবং সর্বোপরি, তাঁর পক্ষে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষণীয় কমপ্লিমেণ্টটি দিয়েছিলো নেপোলিয়নের সঙ্গে তাঁর তুলনা ক'রে।'

এ-কথা কে না জানে (অন্য এক দিন, আমার অন্য একজন সহকর্মীর মুখে শুনেছিলাম আমি) যে ভরদ্বাজ কলেজের ছাত্রীরা সুভদ্রা দেবীর নাম দিয়েছিলো মিস নেপোলিয়ন, বংশানুক্রমে নিজেদের মধ্যে ঐ নামই ব্যবহার করতো তারা; প্রথম দিকে ওতে কিছুটা ছেলেমানুষি বা চপলতা থাকলেও, শেষ পর্যন্ত ওটা একটা শাদাশিধে তথ্যের মতো হ'য়ে গিয়েছিলো ছাত্রীদের মুখে-মুখে; অধ্যাপিকারা সবাই তা জানতেন, কিন্তু কেউ কিছু মনে করতেন না বা ব্যাপারটাকে কৌতুকাবহ ব'লেও ভাবতেন না; সুভদ্রা দেবী নিজেও জানতেন, কিন্তু রুষ্ট হওয়া দূরে থাক, একটু নাকি খুশিই হয়েছিলেন মনে-মনে —সত্যি নাকি নেপোলিয়নের মতো হ'তেই তিনি চেয়েছিলেন, আর

অংশত তা যে পেরেছিলেন ছাত্রীদের পদ্যটাই তা প্রমাণ করে। এই মুক্তিগ্রামেও—তিনি এসে পৌঁছবার আগেই তাঁর ঐ নাম রটনা হ'য়ে গিয়েছিলো, যদিও এখানে অত খোলাখুলিভাবে ওটা ব্যবহার করার প্রথা নেই। 'আর ভদ্রমহিলার মুখের সঙ্গে নেপোলিয়নের কী আশ্চর্য মিল তা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন?'

আগেই বলেছি, মুক্তিগ্রাম জায়গাটি কিছু জনরববহুল। এর এই বৈশিষ্ট্যই প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিলো আমার মনে—প্রথম যখন এসেছিলাম এখানে। অবাক হয়েছিলাম তখন—কী ক'রে প্রত্যেকেই অন্য প্রত্যেকের বিষয়ে এত খবর জানতে পারে—এখনো এই ব্যাপারটিতে পুরোপুরি অভ্যস্ত হ'তে পারিনি। আসবার এক মাসের মধ্যে সুভদ্রা দেবীর (এবং আরো অনেকের) বিষয়ে বহু 'তথ্য' জেনে গিয়েছিলাম; সেগুলো যে ঠিকই তথ্য নয় আজ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাইনি। এত রকম বলাবলির মধ্যে কোনটা কতটুকু সত্য বা সত্য নয়, তা যাচাই করার কোনো উপায় নেই অবশ্য; 'যা রটে তার কিছু তো বটে' এ-কথা সত্য হ'তে পারে, কিন্তু যা কখনো ঘটেনি তাও যে বাতাসের মতো র'টে যেতে পারে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো মানুষ তার উদ্ভাবনাতেও সত্যেরই সেবা করে; যা-কিছু সে বলে তার গভীরতম মূলে কিছু-না-কিছু সত্যের কণা থাকে নিশ্চয়ই, কিন্তু তার প্রকাশ হয় অনেক সময় এমন বেঁকিয়ে-চুরিয়ে, ঘুরিয়ে, ভেঙে, রাঙিয়ে, এমনভাবে নিজ-নিজ ইচ্ছা বা বেদনার সঙ্গে মিশিয়ে, যে সাধারণ দৃষ্টিতে আর ধরাই পড়ে না যে তার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্বন্ধ আছে। এ-অবস্থায় শোনা কথা যদি পাঁচ বার সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়, তবু ছয়বারের বার তাকে অসত্য ব'লে ধ'রে নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্তত আমার তো তা-ই মনে হয়।

অবশ্য, যাঁরা শক্তিশালী ও উচ্চপদস্থ, তাঁদের নিয়ে লোকেরা যে পাঁচ কথা বলে, এটা সম্পূর্ণ বৈধ ও স্বাভাবিক, এতে আপত্তি করাটা

সাধুতার একগুঁয়েমি, এই নির্দোষ আমোদ থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করার অধিকার কারোরই আছে ব'লে আমার মনে হয় না। সেকালে যেমন জমিদারবাড়ির পুজা-পার্বণে সারা গাঁয়ের পাত পড়তো, তেমনি আজকের দিনে রাজনৈতিক, সাহিত্যিক বা অভিনেত্রীর গৌরবের ছিটেফোঁটা কিছু অংশ সকলেরই প্রাপ্য ব'লে ধ'রে নিতে হবে—আর তা দেবার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'লো তাদের রসনার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা-ঘোষণা। এই ভাবে আমরা সাধারণ লোকেরা খ্যাতি বা কৃতিত্ব জিনিশটাকে দিব্যি চেটে-পুটে বিবর্ণ ক'রে 'থুঃ' ব'লে ফেলে দিতে পারি, সেই সঙ্গে মনের অনেক বিষও বেরিয়ে যায়, সমাজ সুস্থ থাকে। এখানেও, প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি বা সুভদ্রা দেবীর বিষয়ে অনেক রকম অদ্ভুত কথা শুনেও বিচলিত হইনি ; আমাদের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল আর ভূতপূর্ব ইংরেজির অধ্যাপককে নিয়ে সারা মুক্তিগ্রাম যখন গমগমে আওয়াজ দিচ্ছিলো, তখনও—মনে-মনে অসুখী বোধ করলেও অন্তত এটুকু নৈতিক সমর্থন খুঁজে পেয়েছি যে ধনীর পক্ষে দান না-করা যেমন, তেমনি অন্যায় উচ্চাসীনের পক্ষে গুজবহীন জীবন কাটানো। খারাপ—তা, হ্যাঁ, খারাপ লাগতে পারে কারো-কারো, কিন্তু ব্যাপারটা যে বিধানসম্মত তা স্বীকার না-ক'রে উপায় কী।

যাতে আমি অবাক হয়েছিলুম, কলকাতার জীবনের পরে যা রীতিমতো পীড়া দিয়েছিলো আমাকে তা এই যে মুক্তিগ্রামে ক্ষুদ্র-জনকেও মহতের মূল্য দেয়া হয়। হোক নিচু ক্লাশের শিক্ষক, বা লাইব্রেরির কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট বা আমার মতো সদ্য-পৌঁছনো কোনো প্রথম চাকুরে—এমন কেউ নেই, যার বিষয়ে কোনো কথা, কোনো-না-কোনো সময়ে, সকলেই জেনে না-ফেলেছে। কথাগুলো যে 'দোষের' কিছু তা নয়, অধিকাংশ সময় সম্পূর্ণ নিরীহ ; 'গোবিন্দবাবুর বড়ো মেয়ে রেডিওতে অডিশন দিতে যাচ্ছে,' 'আজ ডাকে একটা মস্ত প্যাকেট এসেছে বিজনবাবুর—আমেরিকার ছাপ-মারা,' 'তাপসবাবু'

(অর্থাৎ আমি) 'কাল বিকেলের ট্রেনে আসানসোল গিয়েছিলেন—বম্বে মেলে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে—'এমনি সব খবর, মিথ্যে নয়, কিন্তু এত তুচ্ছ যে তা নিয়ে কথা ব'লে কী করে কেউ সুখ পেতে পারে তা-ই ভেবে অবাক লেগেছে আমার, আর কী ক'রেই বা সকলের বিষয়ে সব খবর অন্য সবাই জেনে ফেলেছে, এটাও কম আশ্চর্য নয়। অবশ্য যা প্রকাশ্যভাবে করা হয় তা জেনে ফেলাটা কিছু কঠিন নয় ; যা কঠিন—এমনকি অস্বাভাবিক—তা হচ্ছে সেগুলো মনে রাখা এবং তা নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু এ-বিষয়েও অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে ; আমি, দু-চার মাস বসবাসের পরেই, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম, পুরো-পুরি মেনে নিতে না-পারলেও বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি। কথাটা এই যে আমরা তো আর কলকাতার হৃদয়হীন বাবুদের মতো নই ; আট নম্বর ফ্ল্যাটে যখন রোগী মারা যাচ্ছে তখন সাত নম্বরে ডিনার-পার্টি করি না আমরা ; সকলেই সকলের খোঁজ নিই, খোঁজ রাখি, বিপদে-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াই, কেউ কোনো ভুল করলে তাকে শুধরে দেবারও চেষ্টা করি। আমাদের মুক্তিগ্রামের জীবনই হ'লো সমবায়-জীবন, সেই চেতনাই এই প্রতিষ্ঠান দুটির ভিত্তি, এই এলাকার মধ্যে কেউই উপেক্ষণীয় নয় আমাদের কাছে, কোনো খবরই তুচ্ছ নয়। সকলকে আপন ব'লে ভাবি ব'লেই সকলের বিষয়ে ঔৎসুক্য আমাদের অক্লান্ত।

মানতেই হবে যে এই মতটাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। লক্ষ করেছি, আমার সহকর্মীদের মতভেদগুলো ছোটো-ছোটো বিষয়ে কখনো স্পষ্ট, কখনো বা উগ্র হ'য়েও ওঠে, কিন্তু কোনো বড়ো ব্যাপারে অধিকাংশই কেমন যন্ত্রের মতো যুক্ত হ'য়ে যায়, কোনো যন্ত্রের ছোটো-ছোটো অংশের মতো। এই যেমন সুভদ্রা দেবীর বিষয়ে লঘু মুহূর্তে যে যা-ই বলুন না, এই চিরকুমারী শিক্ষাসেবিকার প্রতি মনে-মনে প্রায় সকলেই যে শ্রদ্ধায় অবনত, তার প্রমাণ বারে-বারে পেয়েছি। এই এখনো, সুভদ্রা

দেবী যেই উঠে দাঁড়ালেন, অমনি মুহূর্তে সবগুলো চোখ তীরের মতো তাঁর মুখের উপর বিদ্ধ হ'লো। অভিনিবেশের ঐকান্তিকতায় কুঁকড়ে গেলো অনেকের মুখের চামড়া।

শাদা ও ভারি গরদের শাড়ি পরেছেন, আঁচলটা কাঁধের তলায় মস্ত গোল মীনে-করা ব্রোচ দিয়ে আটকানো, ব্লাউজের হাতা কনুইয়ের তলায় ঘন কুঁচি-দেয়া, ঐ মস্ত হল-এর মধ্যে তাঁকে দেখালো যেন ভিক্টরিয়ান আমলের বিদুষী বঙ্গমহিলার জীবন্ত একটি প্রতিকৃতি। কথা আরম্ভ করার আগে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন একটুক্ষণ, চোখের তারা দুটি ছোটো হ'য়ে কাছাকাছি স'রে এলো। তীক্ষ্ণ সরু নাক, নিচের ঠোঁট এত পাৎলা যে আছে ব'লেই মনে হয় না, গায়ের রং পুরোনো হাতির দাঁতের মতো—সব মিলিয়ে কর্সিকান বীরের সঙ্গে কিছুটা আদল আসে বইকি; ঐ বৃদ্ধ কুঁকড়োনো মুখ যেন শুধু প্রতিজ্ঞার তাপে জ্বলজ্বল করছে। অথচ, যেহেতু ঐ মুখ নারীর, পুরুষের নয়, তাই পুরুষদের মনে কেমন যেন ভয়ের ভাব জেগে ওঠে তাঁকে দেখলে, বিশেষত আমরা যারা লঘুমতি যুবক আছি এখনো, আমরা কখনো তাঁর মুখোমুখি পড়লে এমনভাবে মাথা নিচু ক'রে থাকি যেন কোনো অপরাধ করেছি।

'স্যর প্রেসিডেণ্ট, মিস্টার সেক্রেটারি, ডক্টর চৌধুরী, বন্ধুগণ—' ইংরেজিতে আরম্ভ করলেন তিনি, কিন্তু পাঠকের সুবিধের জন্য আমি বাংলায় অনুবাদ ক'রে যাচ্ছি—'আমি শুধু একটি কথা বলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি। সে-কথাটা সেক্রেটারি মশাই ইঙ্গিত করেছেন, সুন্দর সুরুচির সঙ্গে খুব হালকাভাবে ছুঁয়ে গেছেন মাত্র, কিন্তু আমি আজকের দিনে এবং এই মুহূর্তে, বিদ্যাপীঠের নতুন অধ্যক্ষের অভ্যর্থনাকালে, বিষয়টিকে আপনাদের সামনে আরো একটু স্পষ্ট ক'রে তুলতে চাই। আমি সংকোচের দ্বারা আড়ষ্ট রাখবো না নিজেকে, অত্যধিক সৌজন্য-বোধে বদ্ধরসনা হ'য়ে থাকবো না—এমনকি যদি উপস্থিত কারো

সুকুমার হৃদয়বৃত্তিতে আঘাত দিতে হয়, তার জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।'

গভীর স্তব্ধতা নামলো প্রকাণ্ড হলটিতে। নিশ্বাস নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন সুভদ্রা দেবী :

'নিষ্প্রয়োজন—কেননা, সত্যের দাবি সকলের উপরে। সৌজন্য, প্রীতি, হৃদয়বৃত্তি, এগুলো নিজ-নিজ ক্ষেত্রে মূল্যবান, কিন্তু সত্যের দাবি তাদেরও উপরে। সত্যের সঙ্গে তাদের যখন বিরোধ ঘটে, তখন অন্য সব-কিছু পরিহার ক'রে সত্যকে অবলম্বন করাই উচ্চতর মানবধর্ম।

'কিন্তু, বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে জিগেস করতে পারেন : সত্য কী? তাকে কী-ভাবে জানা যায়? মানুষের পক্ষে সত্যকে জানা কি সম্ভব? এ-সব প্রশ্ন, আমি স্বীকার করছি, অত্যন্ত মূল্যবান, দার্শনিক বিচার-সভায় অত্যন্ত মূল্যবান ও জরুরি; এ নিয়ে বারো ঘণ্টা ধ'রে তর্ক করা যায়, হাজার পাতার পুঁথি লিখলেও কথা ফুরোয় না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে? কর্মজীবনে? যেখানে মানুষ কাজ না-ক'রে পারে না, ভুল না-ক'রে পারে না, লুব্ধ না-হ'য়ে পারে না—সেখানে? না, আমরা মানতে বাধ্য যে সেখানেও পদে-পদে সত্যের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় করতে গেলে অপরাধীর শাস্তি হবে না, হত্যাকারীও নিষ্কৃতি পাবে, বিনষ্ট হবে বহুশ্রমজাত সংগঠন, পৃথিবী আর সভ্য মানুষের বাসযোগ্য থাকবে না। আমরা মানতে বাধ্য যে দৈনন্দিন কর্মজীবনে সত্যকে তথ্যের সঙ্গে এক ব'লে না-ভেবে উপায় নাই আমাদের, তথ্যসমূহের অন্বেষণ ও পরীক্ষা দ্বারাই যে-কোনো বিষয়ে সাধু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি আমরা—তা ছাড়া আর উপায় নেই—কোনো রকম ভাবুকতা বা ভাবালুতার প্রভাবে তথ্যকে যাঁরা এড়িয়ে যেতে চান, তাঁরা "আধুনিক কবিতা" নামক প্রহেলিকা রচনা ভিন্ন আর-কোনো কাজেরই উপযুক্ত নন।'

সুভদ্রা দেবীর মৃদু, মার্জিত ও মসৃণ গলা একটু উঁচু শোনালো

এখানে ; 'আধুনিক কবিতা' উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রায় যেন কর্কশ হ'য়ে উঠলো। চকিতের জন্য আমার মনে হ'লো—কিন্তু হয়তো সেটা আমার ভুল ধারণা—যে কোনো-কোনো টেবিলে কেউ-কেউ চোখো-চোখি করলেন ; কিন্তু পরমুহূর্তে আবার সব স্তব্ধ—নীরব ও নিশ্চল দুই অর্থেই। কারো চোখ গোল হ'য়ে উঠেছে শুনতে-শুনতে, কেউ বা একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছেন, আর কেউ বা, যেন মাথা-ধরায় কষ্ট পাচ্ছেন, দু-আঙুলে টিপে ধরেছেন কপাল।

' "আমাদের সংসার সম্প্রতি কিছু আগোছালো হ'য়ে পড়েছিলো"—সেক্রেটারি মশায়ের মুখের কথা উদ্ধৃত করছি আমি। কথাটায় একটা উৎপ্রেক্ষা আছে, আর ভাষাব্যবহারে উৎপ্রেক্ষা অনিবার্য। কিন্তু কখনো-কখনো এমন সময় আসে যখন উৎপ্রেক্ষার পর্দা ছিঁড়ে তথ্যটিকে বের ক'রে নেবার প্রয়োজন হয়। আর তেমনি সময়ে আমরা আজ মিলিত হ'য়েছি—বিদ্যাপীঠ ও শ্রীমতীর শিক্ষাব্রতীরা। এই যে "অগোছালো সংসার", এর পিছনকার তথ্যটি কী, বলুন তো আপনারা? আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছেন, এর উত্তরটি আপনাদের জানা থাকলেও উচ্চারণ করতে পারছেন না, কেননা তা এতই লজ্জাকর যে স্বভাবতই মাথা নিচু হ'য়ে আসছে আপনাদের। শ্লাঘ্য এই লজ্জা, নিজের বা অপরের অপরাধের চেতনা থেকে যার জন্ম। আপনাদের সজ্ঞান, অনুভূতিশীল চিত্তকে সম্মান জানাচ্ছি আমি। তবু, আপনাদের চিত্ত ও বিবেকের যা অজানা নেই, সেই তথ্যটিকে উদ্ঘাটন করাও আমার কর্তব্য, কেননা উদ্ঘাটিত না-হওয়া পর্যন্ত দুর্নীতি উচ্ছিন্ন হয় না।'

যেমন আকাশ স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে বাজ পড়ার আগে, তেমনি, মুহূর্তের জন্য, বিরতি দিলেন সুভদ্রা দেবী।

'হ্যাঁ—দুর্নীতি! ঐ কুৎসিত শব্দটা আমাকেই উচ্চারণ করতে হ'লো। দুর্নীতি প্রবেশ করেছিলো আমাদের মধ্যে ; বিদ্যার বেশে

দুর্নীতি, সংস্কৃতির বেশে দুর্নীতি, সুরুচির বেশে দুর্নীতি।কিন্তু আপনারা তার চিত্তহারী উদারতার বেশ দেখে ভোলেননি, আপনারা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে, এবং আপনাদের সহযোগিতায়—কিছুটা ত্যাগ স্বীকার ক'রেও, কলকাতার কোনো-এক অসূয়াপন্ন পত্রিকার আক্রমণের লক্ষ্য হ'য়েও—আপনাদের সহযোগিতায় মুক্তিগ্রামের কর্তৃপক্ষ সেই দুর্নীতির মুখ্য প্রতিনিধিদের অপসৃত করতে পেরেছেন এই ছায়াচ্ছন্ন আশ্রমিক প্রাঙ্গণ থেকে। সেই ব্যক্তিদের তারুণ্য বা প্রবীণতা, খ্যাতি বা তথাকথিত পাণ্ডিত্য বিচলিত করতে পারেনি আপনাদের, অপ্রিয় সৎকর্ম সম্পাদনে আপনাদের এই নিষ্ঠাকে অভিনন্দন জানাই।'

নিত্যানন্দ মজুমদার, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে প'ড়ে, হঠাৎ করতালি দিলেন এখানে, প্রিন্সিপাল চৌধুরী অনুসরণ করলেন তাঁর, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রেক্ষাগৃহে তার ধুয়ো উঠলো না। আসলে, সুভদ্রা দেবীর বচনগুলি এমন উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছিলো সবাই যে হাত-তালি দিয়েও কালক্ষেপ করতে চায়নি কেউ, হয়তো শারীরিক অর্থেও সাধ্য ছিলো না। স্থবির লীলারামজী একবার ন'ড়ে বসলেন চেয়ারটিতে, মিসেস মজুমদার অস্ফুট শব্দে কেশে উঠলেন।

'কিন্তু দুর্নীতির গতি অতি সূক্ষ্ম ; যক্ষ্মারোগের বীজাণুর মতোই তা সূক্ষ্ম, দুর্মর ও পরাক্রান্ত। অনেকদিন আগে কলকাতার এক হোটেলের ঘরে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক মারা গিয়েছিলেন। কিছুদিন সেই ঘরটায় অন্য বাসিন্দা ছিলেন না, কিন্তু তিন মাস পরে এক যুবক বাসা নিলেন সেখানে, নামজাদা ব্যায়ামবীর তিনি। পাঁচ মাসের মধ্যে রাজযক্ষ্মায় যুবকটির মৃত্যু হ'লো। আত্মীয়রা সন্দিগ্ধ হ'য়ে তদন্ত করালেন। তাতে ধরা পড়লো যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিও যক্ষ্মায় মারা গিয়েছিলেন, আর তার বীজাণু লিপ্ত হ'য়ে ছিলো ঘরের দেয়ালে—যেদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রথম রোগী নিষ্ঠীবনত্যাগ করতেন। স্বাস্থ্যরক্ষার মূল নীতি লঙ্ঘন করার অপরাধে হোটেলের জরিমানা হ'লো।

'যক্ষ্মার বীজাণু দেয়াল আঁকড়ে তিন মাস লুকিয়ে থাকতে পারে, তিন মাস পরেও বধ করতে পারে। কিন্তু তিন মাস কেন—তিন বছর, পাঁচ বছর, দশ বছরেও দুর্নীতির বীজাণু ধ্বংস হয় না, মনোরম প্রচ্ছদের আড়ালে কুটিলভাবে কিলবিল করে, যদি না আমরা বদ্ধপরিকর হই তার উচ্ছেদসাধনে। বন্ধুগণ, ঐ হোটেলের কর্তৃপক্ষের মতো আমরা উদাসীনতায় অপরাধী নই তো? আমাদের ঘরের দেয়াল যথোচিতভাবে বীজাণুমুক্ত করেছি তো আমরা? আসবাবপত্র? বাসনকোশন? শৈথিল্যবশত অবনতি ঘটেনি তো আমাদের পরিচ্ছন্নতার ধারণায়? আমরা প্রত্যেকে নিজ-নিজ বিবেক পরীক্ষা ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছি তো যে শৈথিল্যের প্রতি দুর্বল অনুকম্পা কোথাও লুকিয়ে নেই?

'এই বিদ্যালয় দুটির মূলমন্ত্র কী, তা সেক্রেটারি মশাই মনে করিয়ে দিয়েছেন আমাদের। "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির"! মহৎ বাণী, বীরোচিত এই প্রার্থনা। কিন্তু ঋষিগণ এমন কিছু বলেন না যার বিকৃতি—মানুষের শক্তিহীনতাবশত যার বিকৃতি সম্ভব নয়, প্রচলিত নয়, সমাদৃত নয়। কী অর্থে আমরা গ্রহণ করবো এই বাণীটি —"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির"? এতে যা বলা হচ্ছে তা কি এই যে ভগবানকে ভয় করা নিষ্প্রয়োজন, আবহমান নীতিধর্মকে শ্রদ্ধা করা অর্থহীন, আর কর্তৃপক্ষকে অমান্য করাই বীরত্ব? স্বেচ্ছাচারী হ'লেই মাথা উঁচু ক'রে নির্ভীকভাবে দাঁড়ানো যায়, এই কি কবি বলতে চেয়েছেন? তাঁর উপাস্য কি তবে বিদ্রোহ, অহমিকা, তাঁর আদর্শ পুরুষ বাইবেলের শয়তান? না কি তাঁর বক্তব্য এই যে সেই মানুষই যথার্থ নির্ভীক হ'তে পারে, অটলভাবে মাথা উঁচু ক'রে রাখতে পারে, যে মানুষ ভয় করে তার ভগবানকে, শ্রদ্ধা করে নীতিধর্মকে, উন্নত কোনো আদর্শের কাছে নিজের অহমিকা সানন্দে বিসর্জন দেয়?...'

এই অংশটিতে সুভদ্রা দেবীর গলার আওয়াজ আস্তে-আস্তে উঁচু ও তীক্ষ্ণ হচ্ছিলো ; শেষের দিকে, যেন আবেগের আঘাতে, হঠাৎ গলা বুজে এলো তাঁর। একটু থেমে, হল-এর চারদিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলেন তিনি ; নিচু গলায় আবার আরম্ভ করলেন।

'বন্ধুগণ, এই প্রশ্নের উত্তর উত্থাপন ক'রে আমি আপনাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করবো না ; আপনারা প্রত্যেকে, যে যার অন্তরে অন্বেষণ ক'রে, এর উত্তর পাবেন। কিন্তু এরই সঙ্গে সম্পৃক্ত আর-একটি বাণী আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে চাই, একই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত আর-একটি মহদুক্তি, যেখানে কবিগুরু সাহস ক'রে এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে ভগবান শুধু প্রেমময় নন, ঘৃণাও তাঁর অন্যতম বৃত্তি।

"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

আর কত স্পষ্ট ক'রে বলা যায় যে আমরা যদি অন্যায়কারীকে ঘৃণা করতে না পারি তাহ'লে আমরা নিজেরাই ঘৃণ্য হবো ! ঘৃণা, প্রেমের মতোই, বিরাট একটি নৈতিক শক্তি, যে কোনো কারণে বা ওজুহাতে, সেই শক্তিকে ক্ষীণ হ'তে দিলে আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব হবে, এই কথাটি মনের মধ্যে জাগরূক রাখলেই আমরা মুক্তিগ্রামের আদর্শকে দিনে-দিনে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারবো। কিছুতেই, কিছুতেই কোনো অন্যায় আমরা সহ্য করবো না, অন্যায়কারীকে সহ্য করবো না, আজ থেকে, বন্ধু ও সহকর্মীগণ, এই আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক !'

সুভদ্রা দেবীর ভাষণ শেষ হবার পরেও একটু সময় স্তব্ধ হ'য়ে থাকলো সবাই, যেন ঠিক বুঝতে পারছে না তিনি আরো কিছু বলবেন কিনা, কিংবা যেন আরো কিছু শোনার জন্যই অপেক্ষা করছে। সুভদ্রা দেবী উপবিষ্ট হলেন, আর তারও দশ বা কুড়ি সেকেণ্ড পরে, কয়েক-জনের করতালির ধ্বনি উঠলো, তারপর আরো, আরো ; মিনিটখানেক

পরে হ'ল যেন ফেটে পড়লো শব্দে, আর তার পরেই হঠাৎ নীরবতা। জানি না আমার অনিপুণ লেখনী ঘটনাটির যথাযথ বিবৃতি দিতে পারলে কিনা। অনিশ্চিত আরম্ভ, মুহূর্তের জন্য উচ্ছ্বাস, পরমুহূর্তেই অবসান— অনেকটা যেন এই ভাবে শ্রোতারা অভিনন্দন জানালেন সুভদ্রা দেবীকে, তাঁর প্রখর বাগ্মিতাকে পুরস্কৃত করলেন। কেন হ'লো না স্বতঃস্ফূর্ত ও সর্বানুমত উচ্ছ্বাস, যা, কোনো সন্দেহ নেই, সুভদ্রা দেবীর প্রাপ্য ছিলো? এ-বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা মনে হয় তা এই। বক্তৃতার সর্বশেষ অনুচ্ছেদে ঘৃণার অবতারণা ক'রে একটু হয়তো আতিশয্য করেছিলেন এই মহীয়সী; নিজের ধর্মোদ্দীপনায় তখনকার মতো ভুলে গিয়েছিলেন সে মানুষ তার স্বাভাবিক 'শক্তিহীনতাবশত' ভালোবাসতেই ভালোবাসে, ঘৃণা করতে বাধ্য হ'লে তার অন্তঃকরণ পীড়িত হয়। আর এই সংসারে যারা পাপী তাপী দুঃখীজন (আর তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি) তারা কেমন ক'রে সেই ভগবানকে ভালোবাসতে পারে, যে-ভগবান নিজেই ঘৃণা করেন? আর ভগবানকে যদি কেড়ে নেয়া হয় তাদের কাছ থেকে, তাহ'লে আর তাদের থাকলো কী?···কিন্তু যাক গে। আমার এত দূর স্পর্ধা নেই যে সুভদ্রা দেবীর বক্তৃতার টীকা হিশেবে নিজের আর-একটি বক্তৃতা জুড়ে দেবো; আমার মোদ্দা কথাটা এই যে, তিনি যদি শেষ অনুচ্ছেদটা বাদ দিতেন, যদি তার ঠিক আগেই, যেখানে একবার একটু থেমে চারদিকে তাকিয়েছিলেন, ঠিক সেখানেই থামতেন যদি, সেই মৌল নৈতিক প্রশ্নটির সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে—তাহ'লে তাঁর ভাষণের অভ্যর্থনা অবিকল তাঁর উপযোগী হতো, কিছুটা দোমনা হ'য়ে কারো-কারো মন-খারাপ ক'রে দিতো না।

এর পর বলতে দাঁড়ালেন প্রিন্সিপাল চৌধুরী। সুশ্রী ভদ্রলোক, মুখের ভাঁজে-ভাঁজে হাসি ছড়ানো; বয়স যদিও পঞ্চাশোর্ধ্বে, একমাত্র গলার চামড়ার দিকে তাকালে বোঝা যায় তিনি পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক

নন। আঁটো যোধপুরি পাজামা পরেছেন, ঈষৎ বেগনি-আভা-যুক্ত আচকান, মাথার একটু বড়ো চুল ঢেউ খেলিয়ে সিঁথি-করা, তিনি উঠে দাঁড়ানোমাত্র সকলেই কেমন স্বস্তি পেলেন, যেন অনেকক্ষণ টান হ'য়ে থাকার পরে নিশ্বাস ফেলে হেলান দিলেন চেয়ারে।

পাঁচ

নতুন প্রিন্সিপালের ভাষণটি সবচেয়ে ছোটো হ'লো। তা হবেই বা না কেন ;—তিনি এইমাত্র এসে পৌঁছলেন এখানে, আর এটা তাঁরই অভ্যর্থনা-সভা (যদিও পূর্ববর্তী বক্তা দু-জন তাঁর বিষয়ে উল্লেখমাত্র করলেন বা তাও করলেন না) ; এখন তাঁর কর্তব্য শুধু সুশ্রাব্য কয়েকটি কথা শোনানো, এই প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তে নিজেকে প্রীতিকর ক'রে তোলা। আর এই কর্তব্য অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করলেন তিনি ; মুখে একটি মধুর হাসি তাঁর লেগেই থাকলো, ধীরে, মনোরম কণ্ঠে, পুষ্পল ভাষায় কথা বললেন—মাঝে-মাঝে শ্রোতৃবৃন্দের একজনকে বেছে নিয়ে এমনভাবে তাকালেন যেন বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিকেই সম্বোধন করছেন ; মাঝে-মাঝে কোনো বাক্যের প্রথমার্ধ উচ্চারণ ক'রে এমনভাবে বিরতি দিলেন যেন পরমুহূর্তেই দারুণ কোনো ঘোষণা বেরোবে তাঁর মুখ দিয়ে। এটি তাঁর পঞ্চম অধ্যক্ষ পদ, আরম্ভ করার এক মিনিটের মধ্যেই জানালেন তিনি, আর চতুর্দশ বিদ্যালয়। দেশে ও বিদেশে সাতটি বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেছেন তিনি, দুই স্থলে অধ্যাপনা করার পরে পর-পর চারটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিলো। কিন্তু এই মুক্তিগ্রামের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পেরে তাঁর মনে হচ্ছে যে তাঁর চরম সৌভাগ্যের লগ্ন উপস্থিত হ'লো ; যেন সত্যই তাঁর চতুর্দশী পূর্ণিমাতে পৌঁছলো এতদিনে।

এখানে ঈষৎ বিরতি দিয়ে তিনি চারদিকে সহাস্যে একবার তাকালেন, যেন যাচাই করতে চান তাঁর সাহিত্যিক উল্লেখটা আমরা ধরতে পেরেছি কিনা। আমার পাশের টেবিলে কে একজন নিচু গলায় মন্তব্য করলেন, 'কিন্তু পূর্ণিমার পরেই কৃষ্ণপক্ষ'—কিন্তু কথাটা

অবশ্য বক্তার কানে পৌঁছলো না, তাঁর মুখশ্রী তেমান অমায়িক ও হাস্যভূষিত হ'য়ে থাকলো।

'দেশবিশ্রুত বিদুষী, পরম শ্রদ্ধেয়া সুভদ্রা দেবীর সহকর্মীরূপে গণ্য হওয়া কি কম ভাগ্যের বিষয়? অবিচল একনিষ্ঠ কর্মী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ মজুমদার, যিনি আইন-ব্যবসায়ে বিপুল উপার্জন পরিহার ক'রে শিক্ষাব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁর সংস্রবলাভ কি কম গৌরবের? আর লীলারামজীর মতো দানবীরের দর্শনলাভেও কি পুণ্য হয় না? আর তার উপর, আপনাদের মতো বিদ্বজ্জনের সাহচর্য, বিদ্যাপীঠের আশ্চর্য শৃঙ্খলা, শিক্ষক ও ছাত্রগণের নিয়মাবদ্ধ প্রীতিস্নিগ্ধ জীবন। বিদ্যা অর্জন ও বিদ্যাদান যার জীবনের কর্ম তার পক্ষে এর চেয়ে আনন্দকর পরিবেশ আর কী হ'তে পারে?'

এর পরে মুক্তিগ্রামের আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি উল্লেখ করলেন ডক্টর চৌধুরী। 'সে-আদর্শ অতি উন্নত তা আগেই শুনেছিলাম, কিন্তু সত্যই যে কত উন্নত তা আজ এখানে আসবার আগে উপলব্ধি করিনি। বর্তমান কালে অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু বিশেষ-বিশেষ বিদ্যা শেখানো হয়, যাকে বলে skills and technics—মানে দক্ষতা ও কৌশল, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বকে বিকশিত করার চেষ্টা হয় না। অথচ মনুষ্যত্বে দরিদ্র হ'লে, অত্যধিক দক্ষতাই মানুষের কত বড়ো শত্রু হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, তার পরিচয় আজকের এই যুদ্ধোন্মাদ জগতে ভয়াবহ-রকম প্রচুর। আবার দক্ষতাকে বর্জন করলে বা বিস্মৃত হ'লেও চলেনা, আমরা ভারতবাসীরা আধুনিক যুগে এই শিক্ষা হাড়ে-হাড়ে পেয়েছি। এখন আমাদের চাই এই দুয়ের মিলন ও সমন্বয়। পাশ্চাত্ত্য কর্মনৈপুণ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় আধ্যাত্মিকতার, ভারতবর্ষীয় সামঞ্জস্য ও শান্তির সঙ্গে য়োরোপীয়...'

কিন্তু আর বোধহয় উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন নেই; পাঠক নিশ্চয়ই এই ধরনের কথাবার্তা ইতিপূর্বে নানা স্থলে পড়েছেন ও শুনেছেন,

বাকিটা অনুমান ক'রে নিতে তাঁর কষ্ট হবে না। এই দুই ধারাকে মিলিত করার চেষ্টা চলছে মুক্তিগ্রামে; আর ডক্টর চৌধুরী, যিনি ভারতবর্ষে সর্বত্র ভ্রমণ ক'রে বহু বিদ্যালয় দর্শন করেছেন, তাঁর মনে হয় না এই পরীক্ষা অন্য কোথাও এত দূর পর্যন্ত সার্থক হয়েছে। নিজের নতুন দায়িত্বের ভারে তিনি রীতিমতো অভিভূত হ'য়ে পড়ছেন; তার যোগ্য ব'লে নিজেকে তিনি যেন প্রমাণ করতে পারেন, এর বেশি কোনো উচ্চাশা তাঁর ধারণার বাইরে।

বক্তৃতার পালা শেষ হ'লো; এর পর মজুমদার মশাই ডক্টর চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের মধ্যে এলেন। এ-টেবিলে দু-মিনিট, ও-টেবিলে দেড় মিনিট, অন্য কোথাও হয়তো তিন মিনিটই কাটিয়ে দেয়া হ'লো—এমনি ক'রে নতুন প্রিন্সিপ্যাল সকলের সঙ্গে 'আলাপ-পরিচয়' করলেন। অবশ্য মজুমদার মশাই সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না তাঁর—আরে না, তা কি সম্ভব? অতগুলো নাম আউড়ে যদি বা যাওয়া যায় এক ঢোঁকে মনে রাখার তো কথাই ওঠে না—বেছে-বেছে কয়েকজনের নাম বলা হ'লো—আমরা অন্যেরা সপ্রতিভ ও প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে থাকলাম। ডক্টর চৌধুরী সযত্নে চেষ্টা করলেন যাতে আমরা কেউ আড়ষ্ট বা অপ্রস্তুত হ'য়ে না পড়ি; বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি, এই তিনটে ভাষায় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে প্রতি টেবিলে ছোটো-ছোটো আলাপ করলেন তিনি; বিদ্যাপীঠ সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান ব'লে যেমন তিনি শেরওয়ানি আর আচকান প'রে এসেছিলেন (হয়তো সেজন্য একটু বাধো-বাধো লাগছিলো তাঁর, কেননা সারা হল-এ আর একজনও ছিলেন না যিনি ঐ পোশাকে এসেছিলেন, স্বয়ং লীলারামজীর পরনে ছিলো ধুতি আর গলাবন্ধ কোট), তেমনি ভাষার ব্যাপারেও তাঁর 'ভারতীয়ত্বে'র অকৃপণ পরিচয় দিতে ভুললেন না; তাঁর বদনমণ্ডল স্থায়ী একটি হাসির ভঙ্গিতে ভূষিত হ'য়ে থাকলো, পকেট থেকে বিলেতি রুপোর সিগারেট-কেস বের ক'রে স্টেট এক্সপ্রেস খুলে ধরলেন

মাঝে-মাঝে—মোটের উপর সকলের ধারণা হ'লো যে তিনি একজন আত্মস্থ, সহৃদয় ও ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। মিনিট পনেরো ধ'রে এই রকম সামাজিকতার পর প্রেসিডেণ্ট গাত্রোত্থান করলেন, সভাভঙ্গ হ'লো।

যাঁরা বড়ো টেবিলে বসেছিলেন তাঁরা নিজেদের বা অন্য কারো গাড়িতে চ'ড়ে অন্তর্হিত হলেন ; অন্যেরা ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত হ'য়ে ছিটকে পড়লেন এদিকে-ওদিকে। সকলে এক দিকে থাকে না, বাড়ি ফেরার তাড়াও নেই সকলের। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি একা হ'য়ে পড়লাম, অন্যমনস্কভাবে পথ নিলাম বাড়ির দিকে।

এখানে বিদ্যাপীঠের ভূগোল বিষয়ে পাঠককে একটু ধারণা দেয়া দরকার। আধুনিক 'প্ল্যান্ড্' পদ্ধতিতে ক্যাম্পাসটি রচিত, কোথাও বাঁকাট্যারা এলোমেলো নেই ; সকলের জন্যই যথাযোগ্য সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা আছে। ঠিক মাঝখান দিয়ে দু-মাইল লম্বা একটি পিচ-বাঁধানো রাস্তা চ'লে গেছে, তারই দু-ধারে বিদ্যালয়ের প্রধান ভবনগুলি, উচ্চপদস্থ অধ্যাপকদের কোয়ার্টার। একতলা বাংলো-বাড়ি, খান পাঁচেক ক'রে ঘর, দুটি বাথরুম, সামনে পিছনে আধ বিঘে জমি। একটু নিভৃতে, প্রায় আড়াই বিঘে জমির উপর একটি চাটালো বারান্দাওলা 'L'-ছাঁদের বাড়িতে প্রিন্সিপ্যাল থাকেন। রাস্তাটির দু-দিকে গাছের সারি, সন্ধের পরে বিজলিবাতি জ্বলে। দু-পাশে কয়েকটি ক'রে ছোটো-ছোটো রাস্তা চ'লে গেছে ; সেখানে দুই বা তিন কামরাওলা বাংলোতে (ছেলেপুলের সংখ্যা অনুসারে দেয়া হয়) অন্যান্য মাষ্টারমশাইদের বসবাস। বড়ো রাস্তাটি—আমরা তাকে নিউ ইয়র্কের ধরনে অ্যাভেনিউ বলি—উত্তরে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দাঁড়ালে ঢেউ-খেলানো প্রান্তর দেখা যায়, দূরে ঝাপসা হালকা-নীল পাহাড়। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি রাস্তা পুবে-পশ্চিমে বেঁকে গেছে এখানটায়, সেই মোড়ের একদিকে ছোটো আর বড়ো ছেলেদের জন্য আলাদা দুটি হস্টেল। বারো বছর

পর্যন্ত ছেলেদের জন্য স্কুলে যাওয়া-আসার বাস্ আছে; অন্যেরা সাইকেল বা স্কুটার চালায়, অনেকে হাঁটে। অন্যদিকে ব্যাচিলার্স কোয়াটার্স—আমি সেটাতেই থাকি—একটা বড়ো দোতলা বাড়িতে ছোটো-ছোটো দু-খানা ঘরের ফ্ল্যাট দেয়া হয় অবিবাহিত শিক্ষকদের; ইচ্ছে করলে তাঁরা স্কুলের হস্টেলেও খেতে পারেন। এইটেই শেষ বাড়ি বিদ্যাপীঠের, এর পর পশ্চিমদিকে মাইল দুয়েক পরে শ্রীমতীর ক্যাম্পাস পাওয়া যাবে।

দক্ষিণে অ্যাভেনিউটি আর-একটি সদর রাস্তায় পড়েছে—সেটা রেল-স্টেশনে যাবার পথ, সেই মোড়ে পান-সিগারেট মুদিখানা মনোহারি প্রভৃতি দোকান আছে, আধ মাইল দূরে সিনেমা, অনেকগুলি সাইকেল-রিকশ অপেক্ষা করে সেখানে। এই সীমান্তের কিছুটা আগে বাঁ দিকে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, ডাক্তার-বাবুর কোয়ার্টার। সেগুলো ছাড়িয়ে আরো দু-একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে।

আমার বর্ণনাশক্তি কম, ক্যাম্পাসের চেহারাটি ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারলাম কিনা জানি না। একটিমাত্র বড়ো রাস্তা শুনে কেউ যেন না ভাবেন যে জায়গাটি আঁটোসাঁটো বা আমরা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে থাকি। তা নয়; বাড়িগুলোর মধ্যে অনেকটা ক'রে ব্যবধান আছে; স্কুলে ও হস্টেলে বিরাট কম্পাউণ্ড ও নানা রকম খেলার ব্যবস্থা, জুনিয়র ও সীনিয়র ফুটবলের মাঠ; মাষ্টারমশাইদের জন্য ব্যাটমিণ্টন ও টেনিসের লন, ক্লাবঘরে টেবল-টেনিস ও অন্যান্য অবসরযাপনের উপাদান। মোটের উপর বেশ একটা খোলামেলা ভাব; সন্ধের কিছু আগে ও পরে অ্যাভেনিউতে বাচ্চারা বেড়াতে বেরোয়, কিংবা প্রবীণ অধ্যাপকেরা সস্ত্রীক খিদে ক'রে বাড়ি ফেরেন—কিন্তু আটটা নাগাদ একেবারে নির্জন হ'য়ে যায় চারদিক, ছেলেরা শহরে সিনেমা দেখতে গেলে মাঠ পেরিয়ে ঘুর-পথে বাড়ি ফেরে, পাছে তাদের পায়ের শব্দে অধ্যাপকদের

শান্তিভঙ্গ হয়। আমরাও, মানে অল্পবয়স্ক মাষ্টারমশাইরা—আমরাও অনেক সময় অ্যাভিনিউ এড়িয়ে দুই দিকের ফাঁকা মাঠেই ভ্রমণ ক'রে থাকি—আমাদের পায়ে-পায়ে অনেক পথ চিহ্নিত হ'য়ে গেছে সেখানে।

তেমনি একটা মাঠের উপর দিয়ে বাড়ির দিকে চলেছি, সামনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, বেশ বাহার হয়েছে মেঘ-ছড়ানো আকাশটায়। হঠাৎ পিছনে গলার আওয়াজ পেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম।

'—এই যে, তাপসবাবু!'

ঐখানে, ঐ সময়ে বেণীমাধব দাসকে দেখতে পেয়ে আমি কিছুটা অবাক হলাম। এর আগে দু-মাস তাঁর সঙ্গে কোনো কথা হয়নি আমার, দৈবাৎ কখনো দেখা হ'লে তিনিই মুখ ফিরিয়ে স'রে গেছেন। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'আপনি কোত্থেকে?'

'আপনি যেখান থেকে, সেখান থেকেই।'

'ও। তা এদিকে যে?'

'মাঠের উপর দিয়ে শর্ট-কাট করার অধিকার আপনারই শুধু আছে নাকি?'

'আপনি তো ঐদিকে থাকেন।'

'নিরুদ্দেশভাবে বেড়াবার অধিকারও আপনার একলার নয়।'

'নিরুদ্দেশভাবে?' আমি বেণীমাধবের মুখের দিকে তাকালাম।

তাঁর গোল মুখে মিটমিটে হাসি ফুটে উঠলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'বাব্বাঃ, কী হনহন ক'রে হাঁটছিলেন আপনি—আমার ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছেন, মশাই। ভাগ্যিশ সূর্যাস্তের শোভা দেখবার জন্য একটু ঢিলে দিয়েছিলেন—তাই তো ধরতে পারলুম আপনাকে। একটু আস্তে, দয়া ক'রে একটু আস্তে চলুন। মোটাসোটা নধর যুবকদের প্রতি দয়া রাখবেন একটু। এই যে, একটা সিগারেট নিন।'

'না, ধন্যবাদ।'

'ওঃ, হাঁপিয়ে গেছি আপনার পিছনে ছুটে। এখানটা বেশ পরিষ্কার

আছে মনে হচ্ছে, আর আকাশও এখনো গোলাপি আছে। আসুন একটু ব'সে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করা যাক।'

'আমার সময় নেই,' আমি চলা থামালাম না।

'আচ্ছা, না-ই বা বসলেন, অন্তত একটু আস্তে চলুন। আর-একটু। আমার কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

আমি বেণীমাধবের দিকে না-তাকিয়ে হাঁটতে লাগলাম। 'বলুন, কী কথা।'

'দাঁড়ান, আগে দম নিতে দিন'—আমার পাশে-পাশে হাঁটতে লাগলেন বেণীমাধব, 'আমি আপনার চাইতে অন্তত চার ইঞ্চি বেঁটে, আয়তনে দ্বিগুণ। একটু করুণা করুন আমাকে।'

লোকটার ভাঁড়ামি অসহ্য হ'য়ে উঠলো আমার; কিছু বললাম না।

'আপনার যেন মেজাজটা বেশি ভালো নেই?' মুখ না-ফিরিয়েও বুঝতে পারছিলাম বেণীমাধব আড়চোখে লক্ষ করছেন আমাকে। 'তা মেজাজের আর দোষ কী—যা সব বক্তৃতা হ'লো! কেমন লাগলো আপনার?'

'কিসের কথা বলছেন?'

'এই—আজকের অনুষ্ঠান?'

'ভালো—খুব ভালো লাগলো।'

'নতুন প্রিন্সিপালকে?'

'ভালো।'

'সত্যি?'

'ভদ্রলোককে এই প্রথম চোখে দেখলাম—এর বেশি আর-কিছু আমার বলার নেই।'

'কিন্তু চোখে দেখেই ভালো ব'লে বুঝতে পারলেন?'

'তা-ই মনে হ'লো।'

'তা ভালো বইকি, এক অর্থে খুবই ভালো। মজুমদার আর

সুভদ্রা দেবীর হাতের পুতুল হ'য়ে থাকবে—কোনো অসুবিধে আর হবে না। চৌধুরী ডক্টরেট কিসে জানেন?'

'জানি না।'

'শেক্সপীয়রের নাটকে "ইণ্ডিয়া" কথাটা কত বার আছে তার একটা তালিকা ক'রে দিয়ে পি.-এইচ. ডি. পেয়েছিলেন লণ্ডনে। থীসিসের নাম "শেক্সপীয়র ও ভারতবর্ষ"।'

'এটা বোধহয় বানানো কথা।'

'বানানো কেন হ'তে যাবে? "আহা, বিদেশী লোক, কষ্ট ক'রে এত দূরে পড়তে এসেছে—না-হয় দিয়ে দেখা যাক ডিগ্রিটা, যদি ওর জোরে দেশে গিয়ে ক'রে খেতে পারে।"—বিলেতি ইউনিভার্সিটিগুলো এ-ই তো ভাবে আমাদের বিষয়ে।'

'আমি বিশ্বাস করি না এ-কথা।'

'তা না-হ'লে কেমন ক'রে সম্ভব হয় যে দেশে যিনি থার্ড ক্লাশ এম.এ. তিনি বিলেতে গিয়ে ডক্টরেট নিয়ে আসেন?'

'কেন হ'তে পারবে না? দৈবাৎ পরীক্ষায় খারাপ হ'য়ে যায় কত সময়—একটাতে নেমে গিয়ে অন্যটাতে সসম্মানে উৎরে যাচ্ছে না কি অনেকে?'

'আপনি বড়ো একগুঁয়ে মানুষ, তাপসবাবু, একবার যা ধরবেন তা আর ছাড়বেন না। আপনার বিষয় হ'লো ইতিহাস—নানা মুনির নানা মতে সর্বদাই সেখানে কান ঝালাপালা, তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কুটোটি আঁকড়ে ধরতে পারলেও খুশি হন আপনি। এদিকে আমার কারবার গণিত নিয়ে, এমন একটা স্থির শাস্ত্র যাতে মতভেদের কোনো অবকাশ নেই; তাই আমার আবার তর্ক যত ভালো লাগে তত ভালো আর-কিছুই লাগে না। চৌধুরী মশাই থার্ড ক্লাশ এম. এ., এটাও বোধহয় বিশ্বাস হ'লো না আপনার?'

'খবরটা কিছু জরুরি মনে হচ্ছে না আমার কাছে।'

'জরুরি নয়? এত বড়ো একটা প্রতিষ্ঠান, যার যশোসৌরভে নিখিলভারত আমোদিত, তার প্রিন্সিপ্যাল একজন থার্ড ক্লাশ এম. এ., —এই কথাটা কি এক কানে শুনে আরেক কানে বের ক'রে দেবার? আর যেখানে চিন্তামণি দত্তের মতো খাঁটি মনীষী কাজ ক'রে গেছেন, সেখানে—'

বেণীমাধব থামলেন, কিন্তু কথার অভাবে নয়। আমার গালের পেশীতে ঈষৎ কম্পন অনুভব করলাম আমি, কিন্তু মুখ ফেরালাম না, তাকিয়ে রইলাম সোজা সামনের দিকে।

' "এই আমার পঞ্চম অধ্যক্ষপদ—" ' বেণীমাধবের গলায় কৌতুকের ঢেউ উঠলো, ' "আমার চতুর্দশ বিদ্যালয়" '! কিন্তু কোন-কোন বিদ্যালয়ে আগে তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তা জানেন কি? এক : বীরগঞ্জ মহাবিদ্যালয় (মহাবিদ্যালয় মানে হাই স্কুল); দুই : দামোদর ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ (এটা বিহারে); তিন : কাছাড় জেলার নীলকান্দি গার্লস কলেজ; চার : মধ্যভারতের শঙ্করলাল ইনস্টিট্যুশন, সেখানে অবশ্য পাসকোর্সে বি. এ. পড়ানো হয়—'

'কিন্তু বিদ্যাপীঠে তো বি. এ-ও নেই—' আমি বাধা দিলাম বেণীমাধবের কথায়—'আসলে তো স্কুল এটা, তা-ই কি নয়?'

'কিন্তু কী স্কুল! কত ছাত্র, কত বড়ো ক্যাম্পাস, আর কত বিষয় পড়ানো হয়! এখানকার অনেক ছাত্র সোজা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজে ভর্তি হ'তে পেরেছে, জানেন? আর কী পেল্লায় মাইনে মাষ্টার মশাইদের! প্রেফেসরদের বারো শো পর্যন্ত, আর প্রিন্সিপাল ষোলো শো প্লাস ফ্রী কোয়ার্টার্স প্লাস মালি বেয়ারা। জানেন, পার্বতীপ্রসাদ শেষ মাইনে পেতেন সাতশো প্লাস ডি. এ.?'

'তা যোগ্য ব্যক্তির যথোচিত সমাদর সব সময় হয় না ব'লে কখনো হয় না তা তো নয়। হ'লেই তো আনন্দের কথা।'

'ভাবুন একবার, কোথায় সাতশো, আর কোথায় দু-হাজার—'

আমার কথাটা যেন কানেই তুললেন না বেণীমাধব—'ফাউ নিয়ে প্রায় ও-রকমই পড়ে বইকি। শঙ্করলাল ইনস্টিট্যুশনের আগের প্রিন্সিপাল পেতেন এক হাজার—গ্রেডের সেটাই ম্যাক্সিমাম, কিন্তু পার্বতী-প্রসাদকে সাড়ে-ছ'শোতে স্টার্ট দেয়া হ'লো। তার কি কোনো কারণ নেই। আর এই যে তিনি ঘন-ঘন চাকরি বদল করেছেন, বিহার থেকে আসাম, আবার আসাম থেকে মধ্যভারতে ছোটেন, সেটাও কি একেবারে অকারণ বলতে চান? নীলকান্দি গার্লস কলেজের মেয়েরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পিটিশন দিয়েছিলো তাঁর বিরুদ্ধে।'

'এত খবর আপনি কোথায় পান?'

'আসামে আমার আত্মীয় আছে, তাঁর চিঠিতে জেনেছি,' চকচকে গালের ভাঁজে হাসির রেখা পড়লো বেণীমাধবের।

'দামোদর কলেজেও আপনার আত্মীয় কেউ আছেন বোধহয়,' আমি আড়চোখে লোকটার দিকে তাকালাম।

'আমি যা বলছি সবই ফ্যাক্ট,' বেণীমাধব গম্ভীর হলেন 'বিশ্বাস করা না-করা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু ভাববেন না এই তথ্যগুলো আমি ব্যবহার করবো কোনো রকমে। এই বিদ্যাপীঠে আমার যা কাজ তা তিন মাস আগেই শেষ ক'রে দিয়েছি।'

'তার মানে?' কথাটা আমি বলতে চাইনি, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

'বিদ্যাপীঠের স্বরূপ আমি উদঘাটন ক'রে দিয়েছি; হাটে দিয়েছি হাঁড়ি ভেঙে, আলমারি থেকে টেনে বের করেছি কঙ্কাল। এখানকার ব্যাপার বুঝতে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির আর দেরি হবে না। মাঝখান থেকে ভিক্টিম হ'তে হ'লো নবেন্দু গুপ্তকে, সেটা দুঃখের, কিন্তু—'

ঝাপটা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, বেণীমাধবের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। খোলা মাঠে আলো মিলিয়ে আসছে, তবু আমি বুঝতে পারলাম মুহূর্তের জন্য একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলেন তিনি। কিন্তু পরক্ষণে একটি নিরভিমান হাসি তাঁর মাখনের মতো মোলায়েম মুখে ছড়িয়ে পড়লো।

'বাব্বাঃ, আমাকে চমকে দিয়েছিলেন আপনি, কী-রকম হিংস্র হ'য়ে উঠেছিলো আপনার চোখ দুটো! মোটা মানুষকে দয়া করুন তাপসবাবু, আমার হার্টের গতিক তেমন সুবিধের নয়, একটুতেই ধড়ফড় করে। মিস্টার গুপ্তর কোনো চিঠি পেয়েছেন সম্প্রতি?'

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'পেয়েছি।'

'কী লিখেছেন?'

'কী লিখেছেন আপনি তা জানেন না?'

বেণীমাধব আমার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন।

'ঐ আপনার এক ভুল ধারণা, তাপসবাবু, একেবারেই ভুল ধারণা। আমার উপর বড্ড অবিচার করছেন আপনি। গুজবের লক্ষ ফণা, কিন্তু সুখের বিষয় তার সবগুলোতে বিষ নেই, আর বিষাক্ত-গুলোকে দেখামাত্র ছিঁড়ে ফেলতে হয়। বিশ্বাস করলেন কি গেলেন, কিন্তু জোঁকের যেমন নুন, গুজবের ওষুধই তেমনি অবিশ্বাস।—মাপ করুন, আপনাকে উপদেশ দেবার মতো ধৃষ্টতা নেই আমার, শুধু আপনার ভুল ধারণাটা ভাঙিয়ে দিতে চাচ্ছি। আচ্ছা, এই যে কয়েক মাস আগে আপনি শুনেছিলেন—সবাই ফিশফাশ করেছে তা নিয়ে—যে বিদ্যাপীঠের কোনো-কোনো ব্যক্তির চিঠিপত্র সব খোলা হচ্ছে—তার কোনো প্রমাণ কেউ পেয়েছে কি?'

'আমি পেয়েছি। আমার অনেক চিঠি খোয়া গেছে সে-সময়ে—যেতেও, আসতেও। শেষটায় রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠাতে হয়েছে।'

'খোয়া গেছে মানে? নিশ্চিত জানেন সে-সব চিঠি ডাকে দেয়া হয়েছিলো? নির্ভুল ঠিকানা ছিলো? বা ঠিকানাই লেখা ছিলো খামে? কে বলবে লেখা হ'য়ে, বন্ধ হ'য়ে, তারপর টেবিলের কাগজ-পত্রেই চাপা প'ড়ে যায়নি? কে বলবে ডেড-লেটার আপিশে প'ড়ে নেই এখনো? কে বলবে ডাকওলারা কলকাতার বদলে কালিকাট-এ পাঠিয়ে দেয়নি, বা বিলি করেনি ভুল বাড়িতে? কত রকম সম্ভাবনা আছে! এ-রকম যে হচ্ছে না তাও তো নয়। হামেশাই হচ্ছে! কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আমরা যারা একজাক্ট সায়ান্সের চর্চা করি আমাদের প্রমাণ সম্বন্ধে ধারণা কিছু অন্য রকম। ঐ তো দেখুন, রেজিস্টার্ড চিঠি ঠিক পৌঁচেছে। তার কারণ সেগুলো নির্ভুলভাবে ডাকে দেয়া হয়েছে, ঠিকানাতে গরমিল হয়নি, বিনা টিকিটেও ছেড়ে দেয়া হয়নি। ডাকওলারাও যত্ন নিয়েছে কিছুটা। চিঠি পৌঁছবার অর্ধেক দায়িত্ব আপনার, আর বাকি অর্ধেক ডাক-বিভাগের। এর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আসবে কোত্থেকে? আর যদি বা তা থাকে, যদি ধরুন আপনার সন্দেহই সত্য হয়, তাহ'লে কি ঘুষ-ফুষ দিয়ে রেজিস্টার্ড চিঠিই প'ড়ে নেয়া যায় না ভেবেছেন, নকল রাখা যায় না?'

'আপনার অকপটতার জন্য ধন্যবাদ। অভিজিৎকে লেখা মালতী ঘোষের সেই চিঠিটার কথা ভুলে যাননি বোধহয়?'

বেণীমাধব একটু লাল হলেন, যেন মনে-মনে খুশি হয়েছেন কথাটা শুনে। 'না, ভুলিনি। সুন্দর লিখেছিলো মশাই, ও-রকম একটি চোস্ত প্রেমপত্র উপন্যাসেও কম পড়া যায়। তা কী জানেন—' যদিও এক মাইলের মধ্যেও অন্য লোক ছিলো না, তবু তিনি গলা নিচু করলেন, 'ঐ চিঠিটা ছেলেরাই চুরি করেছিলো, মানে—আমাদের ছাত্রবন্ধুগণ। টিকিটে ছিলো রসুলগঞ্জের ছাপ—আর রসুলগঞ্জ মানেই শ্রীমতী—দেখে

ওদের জিভগুলো দিয়ে লকলক ক'রে লালা ঝরতে লাগলো। চিঠিটা যদি অন্য কোথাও ডাকে দেয়া হ'তো—আসানসোল কি রানীগঞ্জ কি কলকাতায়, আর, একটু বুদ্ধি করলেই সে-ব্যবস্থা করতে পারতো মালতী—তাহ'লে এই দুর্ঘটনাটি এড়ানো যেতো হয়তো। না, কাজটা ভালো করেনি ছেলেরা, কিন্তু অন্য দিকটাও ভেবে দেখুন একবার। কী অস্বাস্থ্যকর এই মুক্তিগ্রামের আবহাওয়া! মোটা খামে মেয়েলি হাতের লেখা থাকলে পাড়াগাঁয়ে চিঠির কী দশা হয় তা তো পড়েছেন প্রভাত মুখুজ্জের গল্পে। কলকাতার পি. জি. হস্টেলে দু-বছর ছিলাম আমি—মেয়েদের লেখা চিঠি প্রায়ই গায়েব হ'য়ে যেতো সেখানে—হোক বোনের, হোক বৌদির, হোক ছাত্রীর। তা কী করবেন বলুন, মানুষ তো মানুষমাত্র, আর যে-রকম সেক্স-রিড্‌ন্‌ দেশ আমাদের! ম্যাট্রিক ক্লাশের পাঠ্যবইয়ে "স্বামী" কথাটা থাকলে ক্লাশসুদ্ধু মেয়ে ফিকফিক ক'রে হেসে ওঠে। ক্লাশ সেভন-এর ছেলে ইংরেজি "she" কথাটার তলায় পেনসিলের দাগ দেয়। আর মুক্তিগ্রামের যা ব্যাপার! জ্বল-জ্যান্ত বড়োসড়ো ছেলেমেয়েগুলো পাশাপাশি দিন কাটাচ্ছে—অথচ পরস্পরে মুখ-দেখাদেখি নেই, একেবারে দেয়াল-ঘেরা চারদিক—এর চেয়ে মর্বিড আর কী ভাবতে পারেন আপনি! আর যারা "শিক্ষাব্রতী" বা "শিক্ষাসেবিকা", তাদেরও তো সকলের তিন কুল গিয়ে চার কুলে ঠেকেনি, সাত চড়ে রা বেরোয় না এমন একটি বৌ নিয়ে ঘর করার মতো সৌভাগ্যও নেই সকলের—তাদের তো তাজা রক্ত দপদপ ক'রে জ্বলছে কারো-কারো—এ-অবস্থায় নিত্যানন্দ কৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ হ'য়ে রাজত্ব করবেন, এ কি ছেলেরাই সহ্য করতে পারে, না আমরাই—'

আমার মুখ দিয়ে সজোরে বেরিয়ে এলো, 'ছি!'

'ক্ষমা করুন, আপনার সুকুমারবৃত্তিতে আঘাত দিতে চাইনি। অনেক কথাই বললে ভালো শোনায় না, আবার না-বললে অন্তরাত্মা

বিষিয়ে ওঠে। এই আপনার কথাই ধরুন। দেড় বছর আগে যখন এসেছিলেন—কী উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, উৎসাহী একটি যুবক ছিলেন আপনি! একই দিনে পাঁচটা ক্লাশ নিয়ে, তিন জায়গায় আড্ডা দিয়ে, এক সেট টেনিস খেলে, ইংরেজি নাটকের রিহার্সেল করিয়ে, তারপর কোনো নতুন বইয়ের একশো পৃষ্ঠা প'ড়ে ওঠা তখন আপনার সাধ্যে কুলোতো। আর আজ? আজ নিয়মমাফিক রুটিনমাফিক হুকুমমাফিক দায়-সারা কাজ ক'রে যাচ্ছেন শুধু—যা ছিলো আপনার আনন্দ তা হ'য়ে উঠেছে কর্তব্য—নিছক কর্তব্য! কেন হয়েছে এ-রকম? যা বললে ভালো শোনায় না, তা কখনোই বলেন না ব'লে, মনে-মনেও চিন্তা করেন না ব'লে। বলুন, ঠিক বলেছি কিনা।'

ঘৃণার একটা প্রকাণ্ড বুদ্বুদ উঠে আমার গলা আটকে দিলো। সন্ধে হ'য়ে গেছে, মাঠে নেমেছে অন্ধকার, দূরে-দূরে ইশারা করছে বিজলি-বাতি। হঠাৎ বুঝলাম, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি মাঠের মধ্যে, ঐ লোকটার মুখোমুখি, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনছি তার প্রলাপ। অদম্য ঘৃণা অনুভব করলাম—লোকটা মিথ্যে বলছে শুধু সেজন্যে নয়, আরো বেশি এজন্যেই যে আমার বিষয়ে—হয়তো বা—সত্য কথাই বলছে সে। হঠাৎ স'রে দাঁড়িয়ে আমি বললাম, 'আমার আর সময় নেই। চলি।'

'দাঁড়ান—আর পাঁচ মিনিট—' আমার পাঞ্জাবির কোণা ধ'রে টান দিলেন বেণীমাধব—'আমার আসল কথাটাই বলা হ'লো না এখনো—একটা বড়ো খবর—কাউকে বলিনি—আপনার জন্যেই জমিয়ে রেখেছি। দয়া ক'রে দাঁড়ান একটু। বন্ধুকে ত্যাগ করবেন না।'

আমি নড়তে পারলাম না। লোকটার নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হ'য়ে তাকিয়ে থাকলাম।

'প্রথমে নবেন্দু গুপ্তর কুশলসংবাদ প্রার্থনা করি। তিনি লণ্ডনেই আছেন?'

'হ্যাঁ।' আমার মনে পড়লো নবেন্দু গুপ্তর ঘটনাটি এই মাঠেই ঘ'টে গিয়েছিলো কিছুদিন আগে।

'ভালো আছেন?'

'চোখে খুব কম দেখছেন। হয়তো অপারেশন হবে।'

মুখ দিয়ে সহানুভূতির আওয়াজ করলেন বেণীমাধব। 'কেন হ'লো ও-রকম? চোখ তো খুব খারাপ ছিলো না তাঁর।'

'জানতে চান কেন? চশমার কাচ ভেঙে চোখের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো, ঠিক চোখের পাতার উপর ঘুষিও পড়েছিলো একটা। হয়তো অন্ধ হ'য়ে যাবেন।'

'না, না, না—অন্ধ হবেন কেন, অন্ধ হবেন কেন। বিলেতে আছেন, কত চমৎকার চিকিৎসা সেখানে—ঠিক সারিয়ে দেবে ওরা। তা ব্যাপারটা দুঃখের। খুবই দুঃখের যে তাঁকেই ভিক্টিম হ'তে হ'লো। কিন্তু—সে-কথাই বলছিলাম—কাউকে-না-কাউকে ভিক্টিম হ'তেই হ'তো। হয় মজুমদার মশাইকে, নয় সুভদ্রা দেবীকে, চাই কী আপনার আমার মতো কোনো চুনোপুঁটিকেই—কিন্তু কোনো একটি বলি না-হ'লে এই পুজো সাঙ্গ হ'তো না। আর কী জানেন—নবেন্দু গুপ্ত মানুষটি ছিলেন একেবারে আইডিএল ভিক্টিম—মানে, বলি হবার মতো প্রত্যেকটি গুণ পুরোপুরি বর্তেছিলো তাঁর মধ্যে—যেন অষ্টমীপুজোর সিঁদুর-পরানো ছাগশিশুটি!—দুঃখিত, আবার হয়তো আপনার সুকুমার বৃত্তিতে আঘাত দিলাম।'

মুহূর্তের জন্য আমার মনে হ'লো আমি বমি ক'রে ফেলবো।

'রাগবেন না তাপসবাবু, দোহাই আপনার, আমিও জানি ভিক্টিমে আর মার্টারে তফাৎটা খুব বেশি নয়। এই এক কোপে নবেন্দু গুপ্ত মহৎ হ'য়ে গেলেন, দেশে স্মৃতি থাকবে তাঁর। শুনছি নাকি আবার দেশে আসতে চান তিনি?'

'হ্যাঁ, দেশে এসে মরতে চান।'

বেণীমাধব হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে উঠলেন কথা শুনে। 'মরতে চান এখানে এসে? চমৎকার! অতি সাধু ইচ্ছা! মরবার পক্ষে বাংলাদেশের মতো উত্তম স্থান আর কোথায় পাবেন পৃথিবীতে? সারা দেশটাই একটা প্রজ্বলিত শ্মশান! বুদ্ধি পুড়ছে, সুবিচার পুড়ছে, এমনকি অতি সাধারণ ভদ্রতা ব'লে যে একটা ব্যাপার আছে তাও ছাই হ'য়ে এলো—রামমোহন বিদ্যাসাগরদের প্রেতাত্মারা ব্রহ্মদত্যি হ'য়ে বটগাছে আশ্রয় নিয়েছেন। মরাই যদি তাঁর ইচ্ছে পত্রপাঠ নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে দিন।'

'বাংলাদেশের যে-বর্ণনা আপনি দিলেন তা যদি সত্য হয় তাহ'লে আপনার উন্নতি অবধারিত।' অন্ধকারে বেণীমাধবের মুখের উপর ঝুঁকে পড়লাম আমি, সেখানে ক্রোধ বা অপ্রতিভতার লক্ষণ দেখার আশায়। কিন্তু তিনি হাঁটু চাপড়ে আবার হ্যা-হ্যা ক'রে হেসে উঠলেন।

'ঠিক! ঠিক! ঠিক ধরেছেন! আমার উন্নতি অবধারিত। অনেক উঁচুতে উঠবো আমি—কত উঁচুতে আপনি তা ভাবতেও পারেন না! দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় যাবো, আমেরিকায় যাবো, চীনে যাবো—যদি অবশ্য আরেকটা যুদ্ধ না বাধে ততদিনে—পনেরো বছরের মধ্যে কলকাতায় তিনটে বাড়ি হবে আমার, তার দুটোতে ফ্ল্যাট ভাড়া দেবো, বছরের মধ্যে দুশো মীটিঙে সভাপতি হবো বা প্রধান অতিথি, কাগজে-কাগজে হেডলাইনে আমার নাম বেরোবে, আমার পতিব্রতা, সুন্দরী ও শিক্ষিতা স্ত্রী মানে-সম্মানে বসনে-ভূষণে অভিভূত হ'য়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দেবেন সময়মতো অন্য কারো বদলে আমাকেই পছন্দ করে-ছিলেন ব'লে। আর সেদিকে আমি রওনা হ'য়ে গেছি এরই মধ্যে—প্রথম পা ফেলেছি বলতে পারেন—সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছি এখন।'

'মুক্তিগ্রাম ছেড়ে যাচ্ছেন?'

'"নিত্যানন্দ কৃষ্ণ" বলেছিলাম ব'লে ও-রকম অনুমান করছেন বোধহয়? তা সবাই ও-রকম বলে মশাই, আরো কত কী বলে, আপনি তো আর কারো সঙ্গে মেশেন না আজকাল। আফট্রল, মানুষ তো সকলেই, বোধ আছে, হৃদয় আছে—নবেন্দু গুপ্তর ব্যাপারে একটা চমক লেগেছে তো! "ওটাকে খুন ক'রে ফেলবো আমি!" রাগের মাথায় ও-রকম কথা বলাই এক জিনিশ, আর সত্যিই বারো-চোদ্দজনে মিলে একটা শাদা চুলের অসহায় মানুষকে মারতে-মারতে রক্ত বের ক'রে দেয়া আরেক কথা। শুনতেই কত খারাপ লাগে ভাবুন, আর চোখে দেখলে! "এর পর কী?" "এর পর কার পালা?" এই রকম বলাবলি হচ্ছে চারদিকে। তা আমি তো চ'লেই যাচ্ছি—তবে যাবার মুখে আমার তৃপ্তি এইটুকু যে দেশের একটা উপকার করতে পারলাম—এই ছোট্ট মুক্তিগ্রামের মধ্য দিয়ে দেখিয়ে দিলাম বাংলা দেশের অবস্থাটা কী! জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা চালিয়ে দিলাম অজ্ঞানের তিমিরে। একটু লাগলো—সবচেয়ে বেশি লাগলো বেচারা নবেন্দু গুপ্তর, কিন্তু তাছাড়া আর উপায় ছিলো না, এ-রকম কিছু না-হ'লে তো আর টনক নড়তো না কারো। এই দেখুন না—আপনার মতো আইডিয়ালিস্টকেও বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছি যে বইখেকো চিন্তাশীলেরা আর টিকবে না বাংলাদেশে—জয় হবে এই বেণীমাধব দাসেদের!' জামার উপরে চওড়া বুকে তু-বার তালি দিলেন বেণীমাধব।

'আপনি সত্যি যাচ্ছেন তাহ'লে?'

'তাই ব'লে নিশ্চিন্ত থাকবেন না—বেণীমাধবের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীরা কিলবিল করছে সারা মুক্তিগ্রামে। —হ্যাঁ যাচ্ছি,' আরো একটু কাছে স'রে এসে তিনি অন্তরঙ্গ হলেন—'ইণ্টার্ভিয়ু পেয়েছি কলকাতার গোবর্ধন কলেজে—আর ইণ্টার্ভিয়ুই বা বলি কেন, অ্যাপয়েণ্টমেণ্টই পেয়ে গেছি, চিঠিটা এই পকেটেই আছে। মাইনে

এখানকার চাইতে পঞ্চাশ টাকা কম হ'লো, খরচও কলকাতায় বিরাট, তা হোক কলকাতা তো, এখনো স্বাধীনভাবে নিশ্বাস নেয়া যায় সেখানে, আর তাছাড়া—জাঁক করছি না, আপনিও মানবেন আমার কথাটা, আমার প্রতিভার পক্ষে উপযোগী ক্ষেত্র কলকাতা ছাড়া সারা ভারতে আর নেই। চাকরিটা তাই নিয়েই নেবো ঠিক করেছি, এদিকে "সারথি" থেকেও একটা অফার আছে।'

' "সারথি"? যারা তখন নবেন্দু গুপ্তর পক্ষ নিয়ে খুব লিখেছিলো?'

'হ্যাঁ, মশাই, তারাই। ওদের ঐ "স্পেশাল আর্টিকেল"গুলো আমিই লিখে পাঠাতাম কিনা।'

'আপনি!'

'কী আশ্চর্য! সারা মুক্তিগ্রামে কারো যা জানতে বাকি নেই আপনি তা জানেন না এখনো?'

'আপনি লিখতেন?'

'তাছাড়া আর কে লিখবে, বলুন। আর কে জানে সব ভিতরকার খবর? অভিজিৎবাবু জানতেন, কলকাতায় খবর-কাগজের আপিশে-আপিশে ছুটোছুটিও তিনি কম করেননি, কিন্তু কেউ কি কান দিয়েছিলো তাঁর কথায়? কেন দেবে? দেবার দরকারই বা কী। তার আগেই যে চারদিকে জাল ছড়িয়ে রেখেছেন বেণীমাধব দাস। 'নবজীবন', 'জনকল্যাণী' আর 'ক্যালকাটা হেরাল্ড' অবশ্য নিজ-নিজ প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন এখানে, নবেন্দু গুপ্তর বিরুদ্ধে যা-কিছু বলা সম্ভব সব আমি সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলাম তাঁদের, বিশেষ ক'রে সুভদ্রা দেবীর বিবৃতিটা—কী দুর্দান্ত জোরালো—"আমরা জানি কোনো-একটি ছাত্রীকে তাঁহার আবাস হইতে প্রাতঃকালে বহির্গত হইতে দেখা গিয়াছিল" মনে আছে?' ফ্যাকফ্যাক ক'রে হেসে উঠলেন বেণীমাধব হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে আবার বলতে লাগলেন, 'তা এতদূর হবার পরে আমার মনে হ'লো যে বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে, ভদ্রলোকের সপক্ষেও

দু-একটা কথা ছাপা হওয়া দরকার এখন, নয়তো ঠিক জমেও না। এক ফাঁকে কলকাতায় গিয়ে দেখা করলাম "সারথি"র সঙ্গে—অল্প চিনতাম ওদের—আমার প্রস্তাব লুফে নিলে ওরা। আমার চারটে আর্টিকেলে ওদের কাটতি বেড়ে গেলো। শুধু তো নবেন্দু গুপ্তর সপক্ষে লিখিনি বা চিন্তামণি দত্তের "মহৎ চরিত্র ও অসামান্য পাণ্ডিত্যে"র স্তুতি ক'রেই থেমে যাইনি—কারো নাম না-ক'রে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, এই বিদ্যাপীঠ আর শ্রীমতীর কর্তৃপক্ষ বিষয়েও এমন সব তথ্য পরিবেশন করেছিলাম—কিন্তু আপনি তো জানেন ও-সব, পড়েছিলেন নিশ্চয়ই!'

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম, 'আপনি বলছেন যে সবাই এখানে জানে যে—'

'—যে আমি চোরকে বলেছি সিঁদ কাটতে আর গৃহস্থকে সজাগ থাকতে? নিশ্চয়ই! আমি নিজেই জানতে দিয়েছি সবাইকে, ইঙ্গিতে চারদিকে ব'লে বেড়িয়েছি, যাতে কথাটা কর্তৃপক্ষেরও কানে ওঠে। আর তা উঠতে যে বাকি নেই তারও প্রমাণ পেয়েছি। এই সেদিন মজুমদার মশাই আমাকে ডেকে কয়েকটা কথা বললেন। তার সারাংশ এই যে তিনি আমাকে সীনিয়র গ্রেডে প্রোমোট করতে চান, আর যদি হস্টেলের এ-ব্লকের সুপারিনটেনডেণ্ট হ'তে ইচ্ছে করি—তার মানে দাঁড়ালো আপাতত মাসে সাড়ে-সাতশো, কিন্তু আমার যে-রকম যোগ্যতা আর লয়্যালটি, তাতে নাকি কোনো-এক কালে প্রিন্সিপাল হবারও সম্ভাবনা আছে আমার।—কেমন লাগছে আপনার শুনতে?'

'আর আপনি কী বললেন?' কথাটা বলার জন্য নিজের উপর রাগ হ'লো আমার, কিন্তু না-ব'লেও পারলাম না।

'ধন্যবাদ, সুক্রিয়া, থ্যাঙ্কিউ স্যর, মের্সি বিয়ঁ—কিন্তু কালকেই আমার পদত্যাগপত্র মজুমদারের দপ্তরে পৌঁছবে। অল্প কয়েকটা টাকা ছুঁড়ে দিয়ে মুক্তিগ্রামের মতো মফস্বলে যাকে আটকে রাখা যায় তার

নাম পার্বতীপ্রসাদ চৌধুরী, বেণীমাধব দাস নয়।···তাছাড়া অন্য একটা কারণেও—জরুরি কারণ বলতে পারেন—আমার এখন কলকাতায় থাকা দরকার। আপনার মতো ছেলেমানুষ তো নই, বয়স বত্রিশ হ'লো, ব্রহ্মচর্য আর ভালো লাগছে না।'

বেণীমাধব থামলেন, যেন আমাকে কিছু মন্তব্য করার সময় দিয়ে। কিন্তু আমি নীরব।

'আমি এবার বিবাহ করবো স্থির করেছি,' গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন তিনি। 'পাত্রীও একরকম স্থির···মানে, কোর্টশিপ চালাচ্ছি, বঁড়শি ফেলে ব'সে আছি ধৈর্য ধ'রে, কাৎলা মাছটি ঘাই মেরে-মেরে স'রে যাচ্ছে এক-একবার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাঙায় তুলতে পারবো না তেমন বোধ হচ্ছে না।

'আপনার ভাবী স্ত্রীর বিষয়ে অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করছেন।'

'অদ্ভুত কিছু না—অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে এগোতে হচ্ছে এই ব্যাপারে। পাত্রীটির নাম শুনলেই বুঝবেন কী কঠিন কাজ হাতে নিয়েছি।'

'আপনার ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই।'

'নেই? যদি বলি আমি মালতী ঘোষকে বিয়ে করছি?'

'মালতী ঘোষ!' আমি প্রায় ব'সে পড়েছিলাম মাটির উপর, যেন আমার পা দুটো আর দেহের ভার বইতে পারছে না। অন্ধকারে দেখলাম, বেণীমাধবের চোখ দুটো জয়ের উল্লাসে চকচক করছে।

'অবাক হচ্ছেন? কেন, আমি কি মালতী ঘোষের একান্তই অযোগ্য? ঐ বিলেতি-ইস্কুলে-পড়া ঠোঁটে-রং-মাখা ধনীকন্যার সঙ্গে অভিজিৎবাবুকে ছাড়া আর কাউকে বুঝি মানায় না? কিন্তু মেয়ের মায়ের মতটা কিছু অন্য রকম। জানেন, মিসেস ঘোষ অভিজিৎকে চুপি-চুপি ব'লে দিয়েছেন সে যেন আপাতত আর তাঁদের বাড়িতে না

আসে? যে-রকম একটা কেলেঙ্কারি হ'লো, তারপরে কিছুদিন—হ'লো কী আপনার?'

আমি কাঁপতে-কাঁপতে বললাম, 'আর শুনতে চাই না। আপনি থামুন, আমাকে যেতে দিন।' অনুনয়ের সুর বেরোলো আমার গলা দিয়ে, নিজেকে মারতে ইচ্ছে হ'লো সেজন্য, কিন্তু একটি পা তোলার মতো শক্তিও খুঁজে পেলাম না নিজের মধ্যে।

'একটু—আর-একটু—আর পাঁচ মিনিট, ছ-মিনিট—' বেণীমাধব আমার কনুইয়ের তলায় হাত রাখলেন, আমি শিউরে উঠে হাত সরিয়ে নিলাম। 'আমি জানতাম আপনি অবাক হবেন, কিন্তু ভেবে দেখুন ব্যাপারটা কি এতই আশ্চর্য? মেয়েকে পাঠানো হয়েছে বোর্ডিং-স্কুলে—ভালো, নামজাদা স্কুল—সেখানে ও-সব প্রেম-ফ্রেমের ব্যাপার ঘটলে কি ভালো লাগে কোনো মা-বাবার? বিশেষত, মিস্টার ও মিসেস ঘোষের মতো মা-বাবা, ইংলণ্ডে দশ বছর কাটিয়ে যাঁরা পাক্কা পিউরিটান হ'য়ে ফিরেছেন, তাঁরা কী ক'রে বরদাস্ত করেন ও-সব? আবার কাগজেও লেখালেখি হয়েছে এ নিয়ে—যদিও কোনো নাম-টাম ছাপা হয়নি, তবু আত্মীয়মহলে জানাজানি হ'তে কি আর বাকি আছে। মালতী কলকাতায় যে? স্কুল ছেড়ে দিলো নাকি? অভিজিৎ ছেলেটি যেন ঘন-ঘন আসে যায়? এ-অবস্থায় মেয়ের মা যদি অভিজিৎকে ডেকে দুটো সৎকথা শুনিয়ে থাকেন খুব কি অন্যায় করেছেন? বেশি কিছু না—অভিজিৎ কিছুদিন গা-ঢাকা দিক, মুক্তিগ্রাম নিয়ে হৈ-চৈটা মিটে যাক, তারপর লোকেরা এ-সব ভুলে গেলে কিছু-একটা স্থির করা যাবে ভেবে-চিন্তে। মেয়েকেও তা-ই বোঝানো হ'লো। আর ইতিমধ্যে অভিজিতের শূন্য স্থান পূরণ করতে এগিয়ে এলেন বেণীমাধব দাস।

'অধ্যাপক হিশেবেই আমার পরিচয় হ'লো সে-বাড়িতে। অধ্যাপক—আর হিতৈষী বন্ধু হিশেবে। মালতী যদিও সোজাসুজি আমার ছাত্রী

ছিলো না কখনো, আর তার বয়সও প্রায় উনিশ, আমি সাহস ক'রে প্রথমেই "তুমি" বললাম—আগেই বলেছিলাম, আপনার জানা থাকতে পারে। অভিভাবকের ভেক ধরলে আসল কাজে তাড়াতাড়ি এগোনো যায়, জানেন তো। আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলাম ঐ লজ্জাকর ঘটনার জন্য, "সারথি" পত্রিকার বাছা-বাছা অংশ প'ড়ে শোনালাম, ওগুলোর লেখক যে আমিই তাও খুব আলগোছে জানিয়ে দেয়া হ'লো। মুক্তিগ্রামের নানা অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে একলা কী-রকম ল'ড়ে গেছি আমি, সে-বিষয়ে আস্তে-আস্তে একটা ধারণা গ'ড়ে তুললাম মালতীর মনে, তার মা-র মনে। অভিজিতের নিন্দে করলাম না ককখনো, কিন্তু মৃদু ও মোলায়েম প্রশংসার দ্বারাই আস্তে-আস্তে তার যে-ছবি ফুটিয়ে তুললাম সেটাকে ঠিক মনোমুগ্ধকর বলা যায় না। চেহারাটা এই রকম দাঁড়ালো যে আমি তাকে সাহায্য করার জন্য, বাঁচাবার জন্য, নানা ভাবে চেষ্টা করছিলাম প্রথম থেকে, কিন্তু সে আমাকে বিশ্বাস করেনি, উল্টে বরং আমাকে অনেক কটুকাটব্য করেছে। তা এ-সব ওর ছেলেমানুষি গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর-কিছু নয়—আমি কিছু মনেও রাখিনি, কিন্তু এর জন্যেই তো চাকরিটা খোয়ালো অভিজিৎ, মালতীকেও মুশকিলে ফেললো—আর ওর বাবা, মানে ডাক্তার মুখার্জিও রীতিমতো অপ্রস্তুত হলেন মুক্তিগ্রামে, হয়তো তাঁকেও মেডিক্যাল অফিসারের পদ ছেড়ে দিতে হবে। সবই ওর গোঁয়ার্তুমির জন্য। অভিজিৎ একটু সাবধানে চললে কিছুই হ'তো না এ-সব—হয়তো নবেন্দু গুপ্তর ব্যাপারটাও এতদূর গড়াতো না।

'একদিন মিসেস ঘোষ আমাকে খুঁটে-খুঁটে নবেন্দু গুপ্তর বিষয়ে অনেক কথা জিগেস করেছিলেন। আমি তার কী জবাব দিয়েছিলাম তার পুনরুক্তি ক'রে আপনাকে কষ্ট দেবো না, তাপসবাবু। কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝতে দিয়েছিলাম যে মালতী সম্পূর্ণ নির্দোষ, নিতান্ত বিপন্ন হ'য়েই তাঁর বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলো, "নবেন্দু গুপ্তর

মনে কোনো বিকার থাকলেও আপনার কন্যার নির্মলতার কাছে তা ব্যর্থ হয়েছে।" '

একটা জ্বলন্ত পিণ্ড আমার গলার কাছে উঠে এলো, আমি যেন নিশ্বাস নিতে পারলাম না।

'অতএব দেখতে পাচ্ছেন,' বেণীমাধব আবার বলতে লাগলেন, 'আমি ঐ পরিবারের বিশ্বাসভাজন হয়েছি। মেয়ের ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রায় উপদেষ্টা। মিস্টার ঘোষের সঙ্গেও দেখা হয় মাঝে-মাঝে—রেলওয়েতে মস্ত এঞ্জিনিয়র তিনি, দাবা খেলার শখ আছে, কে জানতো মশাই যে আমার দাবা খেলার বিদ্যেটা এত বড়ো একটা মহৎ কাজে লেগে যাবে কোনোদিন! তিনি বুঝেছেন আমি একজন "ট্যালেণ্টেড অ্যাণ্ড স্ট্রাগ্‌লিং ইয়ং ম্যান", যে শিগগিরই "রীতিমতো নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে, শিরদাঁড়া-ভাঙা অবস্থায় পথের মধ্যে প'ড়ে থেকে অন্যের চলার ব্যাঘাত ঘটাবে না।" আর মালতী—তার বিশ্বাস আমি অভিজিৎকে ফিরিয়ে আনবো তার কাছে—তাই যেদিনই যাই শেষ কথা জিগেস করে—"আবার করে আসবেন?" ছেলেমানুষ—নিজেই বুঝতে পারছে না যে অভিজিৎ মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে-আস্তে, আর ঐ "আবার কবে আসবেন"-এ ব্যক্তিগত রং লাগতে দেরি নেই। এ-অবস্থায়, বলুন তো, আমার আশা করা কি অন্যায় যে মালতী একদিন—'

'কিছু না, কিছু অন্যায় নয়,' হঠাৎ আমি ভাঙা গলায় চীৎকার ক'রে উঠলাম, 'ন্যায়-অন্যায় ব'লে কিছু নেই আর, আপনি সব ধ্বংস ক'রে দিয়েছেন।'

'আহা—রাগ করেন কেন?' মোলায়েম গলায় জবাব দিলেন বেণীমাধব, 'আপনাকে বন্ধু মনে করি, তাই সব কথা খুলে বললাম। তা ঐ মালতীর কথাটা কিন্তু—যাকগে, মরুকগে, ইচ্ছে হয় বলবেন, যাকে ইচ্ছে তাকে বলবেন, কিছু এসে যায় না ওতে। বরং ভালোই —কোনো রকমে অভিজিতের কানে উঠলে সে হয়তো হতাশ হ'য়ে—'

'হতাশ হ'য়ে আত্মহত্যাও করতে পারে?'

'না, তাপসবাবু, না, আমি সে-কথা ভাবছিলাম না—আবার আপনি অবিচার করলেন আমার উপর। সর্বান্তঃকরণে অভিজিতের কুশলকামনা করি আমি। কেনই বা করবো না? অভিজিৎকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য করবো আমি কি এতই দুর্বল? ধরুন, যদি কোনোক্রমে মালতী ঘোষ ফশকে যায় তাহ'লে অনশনে প্রাণত্যাগ করবো না, ধীরে-সুস্থে আর-একটিকে বাগিয়ে নেবো। ভগবান মানুষকে এমন ক'রেই গড়েছেন যে না-হ'লে চলে না, নয়তো স্ত্রী একটা উৎপাত বই তো নয়, খুব ভালো হ'লে একটা ডেকোরেশন, দিব্যি ঘর সাজানো যায় তা দিয়ে। আপনাকে বললাম ব'লে ভাববেন না যে মালতী ঘোষকে নিয়ে খুব চিন্তিত হ'য়ে আছি—আমার আসল ভাবনা অন্য দিকে। ভাবছি মাষ্টারি ছেড়ে দেবো, বিশ্রী ডাল্ কাজ—মেয়েলি—পুরুষের উপযুক্ত নয়। চারটি দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে গুটিকয়েক নাবালকের উপর বেঁড়ে-ওস্তাদি করতে চাই না আমি, আমি চাই বড়ো সংসারে লড়াই করতে। আর সে-বিষয়েই একটু উপদেশ চাই আপনার কাছে। "সারথি"তে আপাতত পার্ট-টাইম থাকবো, সপ্তাহে দুটো ক'রে কলাম লিখতে হবে, আর মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলা আপিশেও বসবো গিয়ে—হয়তো রোজই বসবো—কিন্তু দু-বছরের মধ্যেই, হয়তো এক বছরের মধ্যেই, কলেজ ছেড়ে দিয়ে পাকাপোক্ত এডিটর হ'য়ে বসবো সেখানে, হ'তেই হবে আমাকে, নয়তো কিছুই হবে না। এখন যিনি এডিটর আছেন তাঁর উপর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মশাই বেশি সন্তুষ্ট নন ব'লে শুনেছি—বড্ড রোখাচোখা লোক, ভেজাল খাদ্য নিয়ে কী এক এডিটরিয়েল লেখার ফলে নাকি অনেকগুলো বিজ্ঞাপন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো একবার। বোধহয় তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা সাপ্তাহিক-টাপ্তাহিক বের করবার প্ল্যান করছেন; তাঁর কাগজ চলবে না, কষ্ট পাবেন, কিন্তু সেটা তাঁর ভাবনা, আমার

নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি "সারথি"র এডিটর আমি হ'য়ে বসেছি, তার সার্কুলেশন ফেঁপে উঠছে মাসে-মাসে, রামরঞ্জন বসুর গলি ছেড়ে আমরা উঠে আসছি ব্রেবর্ন রোডে, কিন্তু—এই এখানটাতেই আপনার উপদেশ চাই, তাপসবাবু, আপনি তো ইতিহাসবিদ্—একটা কথা, শুধু একটা কথা ব'লে দিন আমাকে : কে জিতবে? রাশিয়া, না, আমেরিকা? অবশ্য দেশসুদ্ধ সবাই দু-নৌকোয় পা দিয়েই চলেছে আজকাল, কিন্তু এমন একটা সময় যদি আসে যখন…যখন বেছে না-নিয়ে উপায় থাকবে না? তখন মাঝ-দরিয়ায় ডুবে মরবো না তো? এই একটা বিষয়ে মনস্থির করতে পারলে জর্নালিজম-এ আর ভাবনা থাকে না আমার। বলুন না, তাপসবাবু, আপনার কী মনে হয়?'

' "চোরকে বলবেন সিঁদ কাটতে, গৃহস্থকে বলবেন সজাগ থাকতে" —তাহ'লেই সব হবে আপনার। আর-কিছু ভাবতে হবে না। আপনার নরকের দরজায় বিদায় জানাই আপনাকে।'

ব'লে, আর কোনোদিকে না-তাকিয়ে আমি হনহন ক'রে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম। এতক্ষণে বুঝলাম, আধ ঘণ্টার উপরে ঠায় একভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঐ লোকটার কথা শুনেছি—কোমর ধ'রে গেছে, কানের মধ্যে ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ, মাথার ভিতরটা ফুটন্ত কেটলির মতো টগবগে। দিনের শেষ চিহ্ন মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে, কিন্তু রাত্রির স্নিগ্ধতা নেই, আকাশে মেঘ জ'মে গুমোট হয়েছে। হাঁটতে-হাঁটতে বুঝতে পারলাম দরদর ক'রে ঘামছি, নানা রকম নোংরায় শরীরটা যেন জঘন্য হ'য়ে আছে।—বাড়ি, বাড়ি! আমি প্রায় দৌড়তে লাগলাম মাঠ পেরিয়ে। প্রথমেই স্নান, তারপর ঘর অন্ধকার ক'রে, বনবন পাখার তলায় শুয়ে থাকবো—স্রেফ শুয়ে থাকবো লম্বা হ'য়ে—কিছু করবো না, কিছু ভাববো না। কিন্তু কাছাকাছি এসেই দেখলাম আমার ঘরে আলো জ্বলছে। আর ঘরে ঢুকতেই ফাটা গলার আওয়াজ শুনলাম : 'এত দেরি করলেন, তাপসবাবু?'

॥ সাত ॥

কোলে বই নিয়ে ব'সে ছিলেন বটব্যাল, আমাকে দেখে উৎসুক হ'য়ে চোখ তুললেন। আমি তাঁর কথার জবাব না-দিয়ে হাঁক দিলাম, 'রঘু, এক গ্লাশ জল!'

'আপনাকে কেমন উশকোখুশকো দেখছি। কোথায় গিয়েছিলেন?'

'পথে দেখা হ'লো একজনের সঙ্গে। বড্ড গরম।' পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলে দিলাম আমি, চাকরের হাত থেকে জলের গ্লাশ নিয়ে ঢকঢক ক'রে খেয়ে নিলাম—কয়েক ফোঁটা উপচে প'ড়ে জামার গলা ভিজিয়ে দিলে।

'বড্ড তেষ্টা পেয়েছিলো আপনার!'

'হ্যাঁ। আপনি কতক্ষণ?'

'এই আধ ঘণ্টা হবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। বসুন। ঠাণ্ডা হ'য়ে নিন।'

ঘরের একটিমাত্র ইজিচেয়ারে লোকেনবাবু ব'সে আছেন; ধপাশ ক'রে তক্তাপোশটায় ব'সে পড়লাম আমি, একটা কুশান টেনে নিয়ে গা এলিয়ে দিলাম।

'হ্যাঁ, শুয়ে নিন একটু। বিশ্রাম করুন। ক্লান্ত হয়েছেন মনে হচ্ছে। কার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে আমি বললাম, 'আপনি এসে ভালো করলেন। আপনার কাছে দু-একটা বিষয় জেনে নিতে চাই।'

'তার আগে আমি আপনাকে একটা কথা জিগেস করবো। সেজন্যেই এসেছি। পাশের ঘরে দেবাশিসবাবু আছেন নাকি?'

'জানি না।'

'এ-সময়ে উনি তো তাস খেলতে যান রোজ। রঘুকে ডেকে জিগেস করবেন?'

রঘু এসে খবর দিলে দেবাশিসবাবুর ঘর অন্ধকার, দরজায় তালা।

'এই ব্যাচিলার্স কোয়ার্টারগুলো এমনভাবে তৈরি করেছে যে পাশের ফ্ল্যাটের কথাবার্তা সব শোনা যায়। অন্তত চেষ্টা করলেই শোনা যায়। মাঝখানকার দেয়ালটা ক্যানভাসের। কী বিশ্রী বলুন তো!'

'ব'লে আর কী হবে।'

'কেন, স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কি কারো গোপনীয় কথা থাকতে নেই? একজন মানুষ বিয়ে করেনি ব'লে তার প্রাইভেসিও থাকতে পারবে না?'

'প্রাইভেসি কি খুব বেশি আছে এখানে? কোনোখানেই?'

ফাটা গলায় একবার হাসলেন লোকেনবাবু, ছোট্ট, তেতো হাসি। বিদ্যাপীঠের প্রাচীনতম অধ্যাপক তিনি। প্রাচীন মানে বুড়ো নন—বয়স চল্লিশমতো—কিন্তু এই স্কুলের জন্ম থেকে একটানা আছেন এখানে। ও-রকম আর-কেউ নেই। তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা এসেছিলেন এখানে, সবাই অন্যান্য কাজ নিয়ে একে-একে চ'লে গেছেন; এখানেই বারো বছরের সার্ভিস, শ্রীমতীর বয়স কিছু কম ব'লে, সুভদ্রা দেবীও দেখাতে পারেন না। এ-জন্যে একটু বিশেষ সম্মান প্রাপ্য হওয়া উচিত ছিলো তাঁর—কিন্তু তা হয়নি। তিনি বিদ্যাপীঠের সবচেয়ে অবহেলিত অধ্যাপক, কর্তৃপক্ষের দ্বারাও, সহকর্মীদের দ্বারাও, ছাত্রদের দ্বারাও। তাঁর গ্রেডের ম্যাক্সিমাম, অর্থাৎ সাড়ে-চারশোতে পৌঁছে গেছেন দু-বছর আগে, তাঁর বিষয়ে কর্তৃপক্ষ আর কোনোরকম চিন্তা করছেন ব'লে জানা যায়নি, তিনিও ধ'রেই নিয়েছেন যে সীনিয়র গ্রেডে কখনোই তিনি যাবেন না, বা বোর্ড অব স্টাডিজ-এর মেম্বরও হবেন না—যদিও চিন্তামণি দত্তের আমলে সে-রকম একটা কথা একবার উঠেছিলো। কিন্তু মুক্তিগ্রামের দু-একটা সাম্প্রতিক ঘটনার পরে যখন প্রিন্সিপালের

বদল হ'তে হ'লো তখনই লোকেনবাবু বুঝে নিলেন যে এর পর থেকে বছরে-বছরে তিনি একটু-একটু ক'রে বুড়ো হবেন শুধু, তা ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটবে না।

অথচ, আমি জানি, তিনি শিক্ষক হিশেবে সক্ষম ও যত্নশীল, আর তাছাড়া—সব সময়ে শিক্ষকদের মধ্যে যা পাওয়া যায় না—সাধারণভাবে পড়াশুনোরও অভ্যেস আছে তাঁর। ইণ্টারমীডিয়েট আর সীনিয়র কেম্বি্রজে তিনি ইংরেজি পড়ান, কিন্তু নিচের দিকেও কিছু-কিছু ক্লাশ তাঁকে নিতে হয়, যা কলেজ-বিভাগের অন্য অধ্যাপকদের হয় না। কিন্তু যে-ক্লাশেই পড়াতে হোক যত্ন তাঁর একই রকম ; বিদেশীকে ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতি বিষয়ে যত বই সম্প্রতি বেরিয়েছে সব প'ড়ে ফেলেছেন, এদিকে এইচ. জি. ওএলস-এর কোনো ছোটোগল্পে উল্লিখিত কোনো ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক তথ্য ঠিকমতো জেনে নেবার জন্য আমার কাছ থেকে বড়ো ইতিহাসের বইও নিয়ে যেতে দেখেছি তাঁকে। তিনি মানুষটা যেন স্বভাবতই সাহায্যপরায়ণ ; ছাত্রদের জন্য যথাসাধ্য তো করেনই, সুযোগ পেলে সহকর্মীদেরও কাজে লাগেন। বিদ্যাপীঠ খুব ভালো স্কুল ব'লে এখানে খাতা দেখার চাপ কিছু বেশি, স্কুল-বিভাগে এমন কোনো শিক্ষক নেই যাঁকে সপ্তাহে খান-পঞ্চাশ ক'রে খাতা সংশোধন না-করতে হয়—বলা বাহুল্য, কাজটি সকলের সমান ভালো লাগে না। এখন, কোনো শিক্ষক অসুস্থ হ'য়ে পড়লে (বা তাঁকে 'জরুরি কাজে' কলকাতায় যেতে হ'লে), লোকেনবাবুকে অনুরোধ জানালেই তাঁর খাতাগুলো তিনি রাত জেগে হোক যে ক'রে হোক দেখে দেন—আমি এমনও দেখেছি যে লজিকের একজন নতুন অধ্যাপককে লজিক পড়াবার কায়দা-কানুন তিনি বাৎলে দিচ্ছেন। তাঁর এই দুর্বলতাটি (সাহায্য করার অত্যন্ত বেশি ইচ্ছেটাও একটা দুর্বলতা বইকি) অবশ্য সবাই জেনে নিয়েছে ; তাই, স্বভাবতই, স্কুল-বিভাগের কোনো শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে সেই শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য সকলের আগে

ডাক পড়ে লোকেনবাবুর। তিনি যে খাঁটি মানুষ আর কাজের মানুষ এ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষেও দ্বিমত নেই, আর সেইজন্যেই তাঁর উপর কাজের চাপ বাড়াতে হ'লে কাউকে দু-বার ভাবতে হয় না।

অথচ তিনি অবহেলিত কেন? কারণগুলো খুব দুঃখের, কিন্তু এমন ধরনের যার কোনো প্রতিকার নেই। ভগবান যার উপর অবিচার করেন মানুষ তার কী করতে পারে? প্রথমত, তিনি দেখতে কুৎসিত; দ্বিতীয়ত, তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ; তৃতীয়ত, যাকে 'সামাজিক গুণ' বলে তার কিছুই নেই তাঁর। বড্ড রোগা, বড্ড লম্বা, গাল-ভাঙা, নুয়ে-পড়া নড়বড়ে চেহারা— বসলে হাঁটু দুটো বিশ্রী উঁচু হ'য়ে থাকে, দাঁড়ালে আশে-পাশের সবাইকে অশোভনভাবে ছাড়িয়ে ওঠে। লম্বা পুরুষ তো কতই আছে, কিন্তু তাঁর বেলায় উচ্চতাকে মনে হয় ঔদ্ধত্য, যেন মাথায় অতটা বেড়ে ওঠার অধিকার তাঁর ছিলো না, প্রায় চোখে না-পড়ার মতো ছোটোখাটো হ'লেই মানাতো তাঁকে। হাঁপানির রোগী, শীতের ক-মাস নিয়মিত কষ্ট পান, বর্ষাতেও ভালো থাকেন না; হয়তো নিশ্বাস নেবার জন্য অনবরত যুদ্ধ করতে-করতেই ও-রকম চর্মসার কৃশ হ'য়ে গেছেন, আর সেইজন্যেই তাঁর কণ্ঠস্বরও স্থায়ীভাবে ফেটে অথবা ভেঙে গেছে—কেমন একটা বাঁশ চেরার মতো অপ্রীতিকর আওয়াজ বেরোয়, ক্লাশে পড়াবার সময় খুব চেঁচিয়ে না-বললে তাঁর কথা কেউ শুনতে পায় না। তার উপর—বিধাতার আরেক অভিশাপ—কয়েক বছর আগে কী-এক নতুন পদ্ধতিতে হাঁপানি সারাতে গিয়ে তাঁর দেহে একজিমা দেখা দিলো—পায়ের আঙুলে নয়, হাতের আঙুলে নয়,—আর কোথাও নয়, বেছে-বেছে ঠিক গালের উপর। ঠিক গালের উপর আধুলি-পরিমাণ পুষ্ট সজল একজিমা একটি—তা-ই নিয়েই বেরোতে হয়, পড়াতে হয়, কিন্তু মাঝে-মাঝে চুলকোনি এমন অসহ্য হ'য়ে ওঠে যে ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না ভদ্রলোকের। বারো মাস একভাবে থাকলেও বা কথা

ছিলো, দেখতে-দেখতে তা-ই একরকম স'য়ে যেতো সকলের—আর সেরে গেলে তো কথাই ছিলো না ; কিন্তু প্রহসন এই যে একজিমাটি না সারে, না তাঁকে ছেড়ে যায়—কখনো মিলিয়ে যায় নিজে-নিজেই, বেশ চলে কয়েকমাস, আবার কখনো হঠাৎ ফুঁড়ে ওঠে ঐ একই জায়গায় ঠিক তাঁর গালের উপর। কখন আসবে কখন যাবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাও নেই, ঋতু বা স্বাস্থ্যের সাধারণ অবস্থার উপর তা নির্ভর করে ব'লেও মনে হয় না—আমি দেড় বছরে ঐ উপসর্গকে চার বার যাওয়া-আসা করতে দেখেছি—আমাদের ডাক্তার মুখার্জি সারাবার চেষ্টা ক'রে-ক'রে হয়রান হ'য়ে গেলেন।

এত খুঁত নিয়েও লোকেনবাবু হয়তো প্রিয় ক'রে তুলতে পারতেন নিজেকে, যদি তাঁর চেহারা আর স্বাস্থ্যের ক্রটিগুলো নিয়ে পরিহাস করার ক্ষমতা থাকতো তাঁর ; যদি পারতেন নিজেকে নিয়ে নিজেই হাসাহাসি করতে, তাহ'লে অন্যেরা সেই হাসিতে যোগ না-দিয়ে বরং তাঁর গুণগুলি দেখার চেষ্টা করতো। কিন্তু যাকে আমরা হাস্যরসবোধ বলি, সেই গুণটি থেকেও স্রষ্টা তাঁকে বঞ্চিত করেছিলেন। তা নিয়ে হাসা দূরে থাক তাঁর ব্যক্তিত্বের দুর্বল অংশগুলি বিষয়ে তাঁর স্পর্শ-কাতরতা ছিলো অসাধারণ, প্রায় অসুস্থ। স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত যে-কোনো প্রশ্ন উঠলেই যেন সঙিন-তোলা পাহারা বসিয়ে দেন নিজের চারদিকে ; কেউ খুব সাধারণভাবেও 'কেমন আছেন ?' জিগেস করলে তাঁর চোখে-মুখে যে-ভাবটি ফুটে ওঠে তাকে মর্মবেদনা বললে ভুল হয় না ; 'আজকাল আপনার শরীর ভালো আছে তো ?' এই প্রশ্নটি শুনলে তাঁর মুখ একেবারে কালো হ'য়ে যায়, গম্ভীরভাবে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর এই দুর্বলতা প্রীতিকর নয় স্বীকার করি, কিন্তু সহনীয় ও ক্ষমণীয় নিশ্চয়ই, কেননা এ-কথা যেমন সত্য যে তাঁর অস্বাস্থ্যের জন্য আমরা কেউ দায়ী নই তেমনি এও অনস্বীকার্য যে কষ্টটা আমরা কেউ পাচ্ছি না, তিনিই পাচ্ছেন।

টীচার্স ক্লাব আছে আমাদের, ড্রামাটিক ক্লাব, স্পোর্টিং ক্লাব ইত্যাদি পাঁচ রকম আছে, কিন্তু এ-সব জায়গায় লোকেনবাবুকে বড়ো-একটা দেখা যায় না, পাঁচজন যেখানে একত্র হয় সেখানে প্রায় অস্তিত্বই নেই তাঁর। মনোমতো কাউকে পেলে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভালো-বাসেন, নয়তো তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ের মধ্যে একটি বা ছুটিকে নিয়ে পড়াতে বসেন সন্ধেবেলা, তাঁর পড়ানো কত উৎকৃষ্ট তা প্রত্যেক বছর তাঁর ছেলেমেয়েরা বার্ষিক পরীক্ষায় প্রমাণ ক'রে দেয়। সহকর্মীরা—যখন কোনো সাহায্য নিতে না হয়, তখন কেমন এড়িয়েই চলেন তাঁকে; 'লোকেনবাবুর কোনো বিষয়ে ইন্টারেস্ট নেই, তাঁর সঙ্গে কথা বলা মুশকিল'—এই হ'লো তাঁদের মত। 'না তো!' আমি এর প্রতিবাদ ক'রে বলেছি, 'সাহিত্যে খুব অনুরাগ আছে তাঁর, দর্শনও পড়েছেন কিছু, রেনেসাঁসের ইতিহাস তো— ।' 'আরে মশাই সব সময় কি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ভালো লাগে, হালকা সময়ও তো আছে মানুষের জীবনে। ইরেসমাস কত বছর বয়সে গ্রীক শিখেছিলেন তা জেনে কী বা হবে আমাদের, "জয়দ্রথে"র নতুন কী গল্প বেরোলো সে-কথা বরং শুনতে রাজি আছি—ওঃ, কী একখানা লিখেছিলেন কাপালিকদের জীবন নিয়ে—মাস্টারপীস—আর সব নাকি সত্যি!'

সহকর্মীদের সাহিত্যিক রুচি বিষয়ে মন্তব্য করা আমাকে সাজে না; বিশেষত, কোনো সাহিত্যের অধ্যাপক যখন 'জয়দ্রথ'-প্রণীত 'পঞ্চম' নামক পুস্তককে 'মাস্টারপীস' ব'লে ঘোষণা করেন তখন আমার আর নীরব না-থেকে উপায় কী। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাসকে আলাপের 'বিষয়' ব'লে যাঁরা মানতে চান না, তাঁদের সপক্ষেও যে বলার কিছু নেই তা নয়—জীবনে কিছু হালকা আমোদেরও প্রয়োজন আছে বইকি—আর, আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, লোকেন বটব্যালের সঙ্গটা ঠিক উপভোগ্য নয়। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা যায়, বিতর্ক চালানো যায়, কিন্তু গল্পগুজব জমানো যায় না, এই হ'লো

তাঁর প্রধান অক্ষমতা। অন্যদের তিনি সন্দেহ করবার কারণ দেন যে, উপার্জনে বা মর্যাদায় বড়ো হ'য়েও, দু-একটা বিষয়ে বটব্যালের তাঁরা সমকক্ষ নন—এই হ'লো তাঁর প্রধান অপরাধ।

আমার অবশ্য তেমন খারাপ লাগে না ভদ্রলোককে, বরং ভালোই লাগে, আর প্রথম আলাপের পর থেকেই তিনিও যেন একটু পছন্দই করেছিলেন আমাকে। সুবিধেটা এই যে ব্যক্তিবিশেষের নাড়িভুঁড়ি টেনে বের না-ক'রেও তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, কথা বলা যায় অতীত বিষয়ে, রচিত বিষয়ে, ইতিহাসের বা উপন্যাসের পাত্রপাত্রী বিষয়ে, অনেক-কিছু বলবার থাকে অথচ ভুল বললেও সাংসারিক কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই যেখানে—কিংবা ভুল বা নির্ভুল যেখানে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করাই অসম্ভব। আমার অবশ্য বয়স অল্প, 'জীবনের অভিজ্ঞতা' কিছুই নেই ; কিন্তু পাঠকের অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে আমাদের কথাবার্তা-গুলোকে এই রকম বিষয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারলে বোধহয় ভালোই হয়। 'মিস্টার বী-র সঙ্গে মিসেস সী-র বেশ আশনাই-রোশনাই চলছে আজকাল', এ-রকম একটা সূত্র অবলম্বন ক'রে ঘণ্টাখানেক বেশ মনোরম আড্ডা জমানো যায়, স্বীকার করি ; কিন্তু কথাটা যদি মিস্টার বী, মিসেস সী বা তাঁদের পরিবারভুক্ত কারো কানে ওঠে, তাহ'লে, সেটা সত্য না-হ'লে—বা সত্য হ'লেও—খুবই ব্যথিত হবেন তাঁরা, বিশেষত, যখন জানা যাবে যে এটা নিয়ে যাঁরা মশগুল হয়েছিলেন তাঁরা তাঁদেরই বন্ধুস্থানীয়, মিসেস সী-র হাতের তৈরি অসংখ্য পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করেছিলেন। কিন্তু যদি বলা যায়, 'কর্ণ সত্যিই একটা ক্যাড' বা 'জগতের সাভনারলারা সভ্যতার বিরেচকের কাজ করেন'—তাহ'লে চোদ্দ ঘণ্টা ধ'রে আলোচনা হ'লেও জীবিত, মৃত বা কল্পিত কারোরই কোনো অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই। আর এই রকম কথাবার্তাই লোকেনবাবুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে হ'য়ে থাকে আমার ; বিশেষত, অভিজিৎ যতদিন ছিলো, আমরা তিনজনে এ-সব আলোচনায়

অনেক, অনেক ঘণ্টা কাটিয়েছি, কখনো আমার ঘরে, কখনো বা ডাক্তার মুখার্জির ড্রয়িংরুমে উৎকৃষ্ট নৈশ ভোজনের পর, আর কখনো বা গ্রীষ্মের রাতে ব্যাচিলার্স কোয়াটার-এর সামনে ছোটো জমিটুকুতে বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে। অভিজিতের অভাব সহজে পূরণ হবে না আমার মনে; কিন্তু আজ পর্যন্ত—মুক্তিগ্রামের সাম্প্রতিক দু-একটা ঘটনার পরেও—সহকর্মীদের মধ্যে একমাত্র এই লোকেন বটব্যালের সঙ্গেই আমার কিছু কথাবার্তা সম্ভব হচ্ছে; প্রত্যেকেই কেমন নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেছে এই বিদ্যাপীঠে, শুধু তাঁর আর আমার মধ্যে কোনো সন্দেহ ছায়া ফ্যালেনি।

কিন্তু আর দেরি না-ক'রে, তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তার বিবৃতিটা লিখে ফেলা যাক।

লোকেনবাবু ফাটা গলায় হাসলেন একবার—ছোট্ট, তেতো হাসি। হঠাৎ বললেন : 'দান্তের নরকে পাপীদের কী ঘেঁষাঘেঁষি ! গায়ে-গায়ে আটকে-থাকা গোছা-গোছা কৃমির মতো—তা-ই নয় ? পরস্পরকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কিলবিল করছে সাপের গুষ্টি ! সবচেয়ে ভয়াবহ এই যে পাপীরা বিকটভাবে ঘৃণা করছে পরস্পরকে, কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না অথচ অমনি জড়াজড়ি ক'রে লেপটে না-থেকে উপায় নেই তাদের। নরকের ঠিক অর্থটাই এই।'

'আমি ভাবি, পাপীদের জন্য ভগবান যদি না থাকেন তবে তিনি আছেন কিসের জন্য ? পুণ্যাত্মার তো তাঁকে দিয়ে প্রয়োজন নেই, আর পৃথিবীতে পুরোপুরি পুণ্যাত্মাই বা কে ?'

লোকেনবাবুর ভাঙা গালে হালকা হাসির রেখা পড়লো। যে-সময়ের কথা বলছি তখন তাঁর একজিমা ছিলো না, কিন্তু বার-বার বিক্ষত হ'তে-হ'তে একটি নীল দাগ স্থায়ী হ'য়ে গিয়েছে গালের চামড়ায়, হাসলে তাই ভালো দেখায় না তাঁকে, হাসিটাকে হিংসুক ব'লে ভুল হয়। 'যদি আমাদের পুরাণের কথাই ঠিক হয়, যদি কল্কিরূপে ফিরে আসেন ? ডানাওলা শাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে, তলোয়ার হাতে, দশ দিকে ধ্বংস ছড়িয়ে ? ধ্বংস, আগুন, আতঙ্ক, অত্যাচার ! জগৎ জুড়ে তারই লক্ষণ কি দেখছেন না আজ ? আপনার কি মনে হয় না ভগবানও অহমিকা থেকে মুক্ত নন ? মানুষ যতদিন তাঁর নামে শিকল বানিয়ে বেঁধে রেখেছে মানুষকে, ততদিন তিনি তেমন বিচলিত হননি ; কিন্তু আজ যখন রাষ্ট্রের নামে, উন্নতির নামে, নিরাপত্তার নামে কোটি-কোটি মানুষকে দাসত্বসুখে ডুবিয়ে রাখা হচ্ছে—এখনো কি তিনি সহ্য করবেন ? না, তাঁকে আসতেই হবে আবার ; হয়তো তিনিই সেই

প্রলয়ংকর হাইড্রোজেন বোমা, যা আমরা জানি না কোন পাতালে চুপে-চুপে তৈরি হচ্ছে এখন। বোমা ফাটবে, ভগবান বিস্ফোরিত হবেন।'

তাঁর মুখে এ-ধরনের প্রলাপ শুনে অভ্যেস আছে আমার, অবাক হলাম না। জিগেস করলাম, 'আপনি তাহ'লে ভাবছেন আর-একটা যুদ্ধ হবেই?'

সে-কথার উত্তর না-দিয়ে অন্য কথা পাড়লেন লোকেনবাবু: 'আজকের টী-পার্টিতে কিন্তু ডাক্তার মুখার্জি ছিলেন না।'

'তাই নাকি?...তাই তো।...বা ছিলেন হয়তো, লক্ষ করিনি।'

'না, ছিলেন না,' সংক্ষেপে বললেন বটব্যাল।

'তা ডাক্তার মানুষ, সব সময় কি আর—'

'না, তিনি নিমন্ত্রণ পাননি। আমার সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিলো তাঁর। আমি জানি।'

আমি জানি, লোকেনবাবুর সঙ্গে আমাদের ডাক্তার-সাহেবের যত বেশি যোগাযোগ, ততটা এই বিদ্যাপীঠের অধিবাসীদের মধ্যে আর কারো সঙ্গেই নয়। তার কারণ অবশ্য বটব্যালের স্বাস্থ্যহীনতা। তিনি যে এখনো আরোগ্যের ঠিক আশা রাখেন তা নয়, কিন্তু মাঝে-মাঝে ডাক্তারের কাছে যেতেই তাঁর ভালো লাগে। আর মহীতোষ মুখার্জি মানুষটি এমন সহৃদয়, এমন স্নিগ্ধ স্বভাবের, যে দশ মিনিট তাঁর কথা শুনলেই দেহে-মনে অনেকটা আরাম হয়—অসুখ তিনি সারাতে পারুন আর না-ই পারুন। নিরেনব্বুই জ্বর হ'লেই আমরা কেউ-কেউ তাঁকে ডেকে পাঠাই—অবশ্য তার একটা কারণ তিনি বিদ্যাপীঠের মাইনে-করা মেডিকেল অফিসার, ফী দিতে হয় না; কিন্তু বটব্যালের পক্ষে, মানতেই হবে, ও-রকম সজ্জন চিকিৎসকের সংসর্গ একটা সত্যিকার প্রয়োজন; যা তিনি কারো কাছে বলতে পারেন না, সব সময় মনের তলায় লুকিয়ে রাখেন, তাঁর মনের যে-দুর্বল জায়গাটিতে অন্য কারো

সদিচ্ছাতেও আঘাত লাগে—সেটি নিঃসংকোচে খুলতে পারেন একমাত্র ডাক্তারের কাছেই, শুধু তাঁর কাছেই উদ্‌ঘাটন করতে পারেন তাঁর কষ্ট ; তাঁর দুর্ভাগ্য, তাঁর সমস্যা। অথচ তিনি যে ডাক্তারবাবুর কাছে প্রায়ই যান এ-কথা অন্যদের জানতে দিতেও বটব্যালের ভালো লাগে না। তাই একটু ঘুরিয়ে বললেন, 'দেখা হয়েছিলো।'

আমি একটু উত্তেজিতভাবে বললাম, 'তিনি বলেছেন নিমন্ত্রণ পাননি ?'

'ঠিক তা-ই। দৈবাৎ কথা উঠলো কাল, নয়তো এ-সব কি আর বলবার কথা।'

'আশ্চর্য! কেউ বাকি ছিলো না, আর আমাদের ডাক্তার মুখার্জি—'

'আর-একজনও বাদ গেছেন। নাতালী দে।'

আমি কথা বললাম না।

'এ-সবের অর্থ কী, আপনাকে তা বলা বাহুল্য, তাপসবাবু। একটা খুব খারাপ খবর দিই আপনাকে। ডাক্তার মুখার্জি বিদ্যাপীঠ ছেড়ে দিচ্ছেন।'

'সে কী! তাঁকে ছাড়া বিদ্যাপীঠ কি ভাবা যায় ?'

'দু-মাস আগে চিন্তামণি দত্তকে ছাড়াও ভাবা যেতো না।'

'চিন্তামণি দত্তের কথা আলাদা—অত বড়ো দার্শনিক, পণ্ডিত—নিজের বাড়িতে ব'সে পড়াশুনো করবেন আর মাঝে-মাঝে কিছু লিখবেন আমাদের আত্মাকে উদ্দেশ ক'রে—সেটাই তাঁর ঠিক কাজ, এখানে আসাই তাঁর ভুল হয়েছিলো। কিন্তু ডাক্তার মুখার্জি! তিনি তো শুধু ডাক্তার নন, চাকুরে নন—তিনি এখানকার বন্ধু যে! সুরেন বেয়ারার বৌ যখন ছেলে হ'তে যায়-যায়, কী-রকম ক'রে তাকে বাঁচিয়ে তুললেন, মনে আছে ? নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে রাত দুপুরে দু-ঘণ্টায় ইনজেকশন নিয়ে এলেন আসানসোল থেকে। আর মিসেস

সে-ও কিছু কম করেননি সে সময়ে। আর সেই যে একটা রাস্তার কুকুর গাড়ি চাপা পড়লো তাকে নিয়েও নাতালী—'

'থামুন মশাই,' বটব্যাল একটু রূঢ়ভাবে বাধা দিলেন আমাকে, 'নবেন্দু গুপ্তর হারামণির কথা আশা করি ভুলে যাননি?'

একটা গভীর দুঃখের স্মৃতি ছুরির মতো বিঁধলো আমাকে। আমি কথা বলতে পারলাম না।

'হারামণিকে পাগল ব'লে রায় দেননি মুখার্জি, মেরে ফেলার নির্দেশ দেননি, এ-কথাও বলেননি সে পাগল হ'য়ে স্বাভাবিকভাবে ম'রে গেছে। সেটা ভালো লাগেনি অনেকের। এখন কথা উঠেছে তিনি যে আশে-পাশে চারটে শহরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, শুধু সকালবেলাটি বিদ্যাপীঠে কাটান, আর রাত্রে শুতে আসেন এখানকারই কোয়ার্টারে, এটা বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপ্‌ল্‌-এর সঙ্গে খাপ খায় না। এখানে দরকার ডেডিকেটেড লাইভস, যাঁরা মনে-প্রাণে—'

'কিন্তু—' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—'ডাক্তার মুখার্জির মতো মনে-প্রাণে কাজ করেন আর কে? তাঁর বরাদ্দ সময়ের বাইরেও তো কতবার—এমন কি রাত-বিরেতে—বিজনবাবুর ছেলের টাইফয়েডের সময় তিনি তিন রাত ঘুমোননি।'

'ছেড়ে দিন, মশাই, ও-সব; আর ছেলেমানুষি মানায় না আপনাকে। শুনুন। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে বিদ্যাপীঠের ডাক্তারের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের অনুমতি থাকবে না, আর এই শর্ত ডাক্তার মুখার্জির পক্ষে মেনে নেয়া অবশ্য অসম্ভব। অতএব—'

লোকেনবাবুর হতাশাময় মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। আমি তো বুঝি ডাক্তার মুখার্জির বিচ্ছেদ বটব্যালের পক্ষে কত বড়ো মর্মবেদনা। একমাত্র বন্ধু তাঁর, বলতে গেলে একমাত্র আপন জন।

'তা তিনি এই অঞ্চলেই থাকবেন তো?' একটি রুপোলি রেখা

আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম আমি। 'চারদিকের কোলিয়ারি আর কারখানাগুলোতে জমাট প্র্যাকটিস তাঁর—কী বা তাঁর এসে যায় বিদ্যাপীঠ ছাড়লে।'

'কিন্তু তাঁর মনে খুব লেগেছে। এখানকার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন তো একেবারে।'

'আশ্চর্য!'

'কোনটা আশ্চর্য?'

'এত সব ঘটনার পরেও এখানকার মায়া কাটাতে কষ্ট হচ্ছে?'

'তিনি বলেন, "অভিজিতের জন্য কিছু ভাবি না আমি ; সে যোগ্য ছেলে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু নবেন্দু গুপ্তকে ভুলতে পারি না, লোকেনবাবু। একটা বিষাক্ত পোকা ঢুকেছে এখানকার কারো-কারো মগজে—আমরা যারা এখনো ইনফেক্টেড হইনি, আমাদের উচিত এখানেই থেকে চিকিৎসার চেষ্টা করা।" ঐ তো! নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির ভূত এখনো ওঁর কাঁধ থেকে নামেনি—এখনো প্র্যাকটিকাল হ'তে শিখলেন না। নয়তো কি আর নাতালীকে আশ্রয় দেবার মতো দুর্বুদ্ধি হয়!'

'দুর্বুদ্ধি?'

লোকেনবাবুর মুখে, সব কুশ্রীতা সত্ত্বেও, কৌতুকের রেখা ফুটে উঠলো। শিথিলভাবে বললেন, 'নাতালীর পূর্ব ইতিহাস আপনি জানেন তো?'

'কিছু-কিছু শুনেছি।'

'চেক মেয়ে, হিটলারের আমলে কোনোরকমে ইংলণ্ডে পলাতে পেরেছিলো। মা-বাবা ভাই-বোনের আর খবর পেলো না ; তার মানে—কেউ আর নেই। নার্সিং-এর ট্রেনিং নিলো লণ্ডনে, ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি শিখলো, এ. আর. পি.-তে কাজ করলো তিন বছর, তারপর উত্তর-ফ্রান্সের ফীল্ড-হাসপাতালে। যুদ্ধের শেষে লণ্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হ'লো। তিনিই মিস্টার দে। লণ্ডনেই বিয়ে হ'লো তাঁদের।

'সুধাংশু দে আমাদের এখানে য়োরোপীয় ভাষার অধ্যাপক হ'য়ে এলেন। ফরাশি আর জর্মান পড়াতেন, প্রয়োজন হ'লে ল্যাটিন—যে-সব ছেলে এখান থেকেই সোজা বিদেশে যেতে চায় তাদের তৈরি ক'রে দেয়াই ছিলো তাঁর কাজ। বাড়িতে ছেলেরা গেলে নাতালীও সাহায্য করে জর্মান পড়াতে, কিন্তু কোনো চাকরি সে নিলে না। কাগজে-কলমে সে যোগ্যতাও নেই তার। সে চায় স্ত্রী হ'তে, গৃহিণী হ'তে, মা হ'তে; আর-কিছু চায় না। আমাদের চোখের উপর মাসে-মাসে বাঙালি থেকে বাঙালিতর হ'য়ে উঠতে লাগলো সে; শুধু যে শাড়ি পরে সিঁদুর পরে তা নয়, মুখে-মুখে তোতাপাখির মতো বাংলা বলে, নিয়ম ক'রে রোজ কুড়িটা নতুন শব্দ শেখে, আর অপ্রতিহত বেগে আউড়ে যায় সেগুলো। তার ভুল শুনে অন্যেরা যত হাসে সে হাসে আরো বেশি। বছর খানেকের মধ্যে রীতিমতো বাংলা বলতে শিখলো, পড়তেও শিখলো—শিখলো শুক্তো রাঁধতে, লুচি ভাজতে, আলপনা আঁকতে, এমনকি আচার আমসত্ত্ব তৈরি করতে। অনেক দুঃখ, অনেক মৃত্যু, অনেক বিভীষিকা দেখে এসেছে য়োরোপে; এখন চায় স্ত্রী হ'তে, বাঙালি হ'তে, হিন্দু গৃহলক্ষ্মী হ'তে।—কিন্তু তার অতিঘরনী হবার আগ্রহ ভাগ্যবিধাতার ভালো লাগলো না।

'এক শীতের রাত্রে কলকাতা থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন সুধাংশু দে। কুয়াশা ছিলো, হয়তো একটু বেশি ব্যস্ত হয়েছিলেন স্ত্রীর কাছে ফেরার জন্য। আর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে লরিগুলোর ব্যাপার তো জানেন; সাক্ষাৎ যমদূত এক-একটা। ধাক্কা লাগলো এখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে, রাত দুটোতে খবর পৌঁছলো আসানসোলের হাসপাতাল থেকে। কিন্তু নার্সিঙে শিক্ষিতা স্ত্রীকে পরিচর্যা করার কোনো সুযোগ দিলেন না সুধাংশু দে।

'নাতালী তখন সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা, অকালপ্রসবে সন্তানটিও খোয়া গেলো। নাতালী নিজেও যায়-যায় হয়েছিলো; ডাক্তার মুখার্জি তাকে এনে রাখলেন নিজের বাড়িতে; তিনি আর তাঁর স্ত্রী, দু-জনে মিলে অসাধ্যসাধন ক'রে বাঁচিয়ে তুললেন তাকে। সেরে ওঠার পর দেখা গেলো, নাতালীর মাথা-খারাপ হয়েছে।

'ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় জ্যৈষ্ঠের রোদ্দুরে, আপন মনে বিড়বিড় করে, হাসে, তার জানা তিন-চারটে ভাষায় ঘুম-পাড়ানি গান গায় গুনগুন ক'রে। হস্টেলের কিচেন থেকে সব এঁটোকাঁটা জোগাড় ক'রে নেয় একটা ঝুলিতে, সারা পাড়ায় যত কুকুর আছে সব খেতে আসে তার ডাক শুনে। একদিন—তখন নালন্দা তৈরি হচ্ছে—ইটের পাঁজা থেকে জাতিসাপ বেরোলো, লাঠি দিয়ে সেটাকে মারছে দেখে ডুকরে-ডুকরে সে কী কান্না নাতালীর। নিরীহ, কিন্তু পাগল।

'আবার তাকে নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগলেন ডাক্তার মুখার্জি। তাঁর চিকিৎসায় ফল হ'লো, হয়তো আরো বেশি ফল হ'লো মিসেস মুখার্জির স্নেহে যত্নে। চার মাস পরে সুস্থ হ'য়ে উঠলো নাতালী। ডাক্তার মুখার্জি তাকে স্কুলের হাসপাতালে নার্সের পদ দিলেন, কাজ বেশি কিছু নয়, মাইনেও অল্প; কিন্তু মুখার্জির কোনো বাইরের রোগীরও নার্স দরকার হ'লে নাতালীকে পাঠিয়ে দেন—শুধু টাকার জন্য নয়, টাকা অনেক সময় দিতেও পারে না রোগীরা—তার আত্মার তৃপ্তিরই জন্য।

'কর্তৃপক্ষকে ব'লে আর-একটি কাজও তিনি জুটিয়ে দিলেন নাতালীকে। বাচ্চাদের ক্লাশে ছবি-আঁকা শেখানোর জন্য তাকে নিযুক্ত করা হ'লো। দেশে থাকতে আর্ট স্কুলে পড়েছিলো সে, কোনো সার্টিফিকেট নেই, কিন্তু নিজের আঁকা ছবি আছে দু-একটা। সপ্তাহে চার দিন ক্লাশ নিতে হয় সকালবেলা। বাচ্চাদের সংসর্গ পেয়ে সে এত খুশি হ'লো যে আস্তে-আস্তে তার অবশিষ্ট বিষাদ যেন ঝ'রে পড়লো তার গা থেকে। বাচ্চারা তাকে এত ভালোবাসলো যে "নাতালী"

ছাড়া আর-কিছু বলে না। যারা খুব ছোটো তারা "ভালী" বলে। তাদের কথা বলতে তারও মুখে হাসি ধরে না। ঠিক আগের মতো কি আর হ'লো—কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম যে ডাক্তার মুখার্জি তাকে পুরোপুরি ফিরিয়ে এনেছেন, শুধু মরলোকে নয়, মানুষের মনোলোকেও। সেই থেকে মুখার্জিদের সঙ্গেই আছে সে। দাদা ডাকে, বৌদি ডাকে ; আর কোথাও যাবার কথা কল্পনাও করে না।'

নাতালীকে আমি অনেক দেখেছি, অভিজিৎ থাকতে মুখার্জিদের বাড়িতে যখন প্রায়ই যেতাম অনেকবার কথাও বলেছি তার সঙ্গে ; আমি কাফকা পড়েছি শুনে উৎসাহিত হ'য়ে একদিন অনেক-কিছু বলেছিলো আমাকে, প্রাগ-এর কথা, তার ছেলেবেলার কথা। তার ইতিহাস কিছু-কিছু জানতাম, কিন্তু লোকেনবাবুর মুখে সংক্ষেপে সবটুকু শুনে চমক লাগলো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'তাহ'লে—মুখার্জি যদি চ'লে যান, নাতালীও কি চ'লে যাবে এখান থেকে ?'

'সে কি আর থাকতে চাইবে, না কি চাইলেই পারবে।'

'চাইলেও পারবে না ?'

'না। তার বিরুদ্ধে চার্জ-শীট তৈরি হ'য়ে গেছে।'

'চার্জ-শীট ?'

'মানে—"লিখিত-পড়িত"ভাবে কিছু নয়, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি বুঝেছেন নাতালী দে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে উপযোগী নন। আপনি নিশ্চয়ই তার কারণ জানতে চাইবেন ?' শেষ কথাটা একটা হালকা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে লোকেনবাবুর ঠোঁট থেকে বেরোলো। মুহূর্তের জন্য আরো কুৎসিত দেখালো তাঁকে।

'চিন্তা করতে গেলে অপরাধ তো কম নয়,' ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে লাগলেন বটব্যাল। 'প্রথমত সে বিদেশী, দ্বিতীয়ত সে ইহুদি, তৃতীয়ত সে—'

'কিন্তু আমি যে শুনেছি সে ভারতীয় ন্যাশনালিটি নিয়েছে ?'

'ভুল শোনেননি। কিন্তু গায়ের রং কি বদলায় ? সে হাড়ে-হাড়ে য়োরোপীয়ান তো। আমরা কেউ ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি নিলেই কি আর সাহেব ব'নে যাবো ? না কি সাহেবরাই গণ্য করবে

আমাদের? ও-সব অদল-বদলের চেষ্টা করাটাই ভুল—যে যেখানে জন্মেছে সেটাই তার যথার্থ বাসস্থান। সুখে হোক, দুঃখে হোক, সেখানেই থাকতে হবে। বেগতিক দেখলেই দেশ ছেড়ে কেটে পড়াকে কাপুরুষতা বলে।—'

'কিন্তু এমন কোনো বিশেষ অবস্থা কি নেই—অসাধারণ কোনো ঘটনাচক্র—আর তাছাড়া "দেশ" কথাটার মানেই বা কী। এককালে আফগানিস্তান ভারত ছিলো, এখন আর নেই। এই সেদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ভারত ছিলো, এখন আর নেই। আর চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো ছোটো-ছোটো দেশ তো কতবার—আর তাছাড়া, আমরা কি চাটগাঁয়ে জ'ন্মে কলকাতায় চ'লে আসি না, বিহারে জ'ন্মে দিল্লিতে কাটিয়ে দিই না জীবন?"

'ও-সব আপনার লজিক-চপিং, তাপসবাবু, ওতে কোনো চিঁড়ে ভিজবে না। কাছাকাছি দেশ হ'লে আলাদা কথা; য়োরোপ আর আমেরিকার মধ্যেও বিনিময় সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু য়োরোপের সঙ্গে আমাদের! অ্যাবসার্ড! আজ দুই বিপরীত সভ্যতা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এই জগতে—নিখিল-এশিয়া একত্র হ'য়ে পশ্চিমকে প্রতিহত করবে—মহাচীন, মহাসোভিয়েৎ, আর এই সনাতন ভারতভূমি!'

লোকেনবাবুর মুখের চেহারা হিংস্র হ'য়ে ওঠা সত্ত্বেও তাঁর কথা শুনে আমার হাসি পেলো। বললাম, 'আমি জানি এ-রকম মত অনেকেই আজকাল পোষণ করেন, কিন্তু বিদ্যাপীঠের অস্তিত্বই এই মতের বিরোধিতা করছে না কি? স্কুলটি তো পুরোপুরি বিলেতি মডেলে তৈরি।'

'তাতে কী? জাপানিরা কি বিলেতি মডেলে অনেক কলকব্জা তৈরি করছে না? তাই ব'লে তাদের দেশাত্মবোধ কি কম?'

'এর মধ্যে আবার দেশাত্মবোধের কথা ওঠে কোথায়?'

'ওঠে না! নাতালী দেশত্যাগী, দেশদ্রোহী—তাতে কি সন্দেহ আছে?'

আমি শিউরে উঠলাম কথা শুনে। 'এ-রকম বলছে কেউ ?'

'বাঃ, ফ্যাক্ট দেখতে হবে না ? রিয়েল ফ্যাক্টস! শুধু ভাবের আবেগে চললে তো হবে না মশাই। মা-বাবাকে বিপদের মুখে ফেলে যে-মেয়ে পালিয়ে যায়—'

'তা-ই কি সত্যি ?'

'মা-বাবা ভেবেছিলেন পরে আসবেন; সুযোগ পেয়ে বড়ো মেয়েকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরে কী হ'লো— কোথায় লুপ্ত হ'য়ে গেলেন কিছু আর জানাই গেলো না।—ফ্যাক্ট হিশেবে এটাই রইলো যে বাড়ির বড়ো মেয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে সকলের আগে পালিয়েছিলো। ইহুদির পক্ষে সবই সম্ভব।'

আমি আস্তে-আস্তে বললাম, 'নাতালী ইহুদি ?'

'পিতামহ ইহুদি ছিলেন, একুশ বছর বয়সে খ্রীষ্টান হন। তা না-হ'লে আইন পড়তে দেবে না। নাতালীই বলেছে এ-সব—আর এটাই একটা খুব কড়া যুক্তি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে নাতালীর বিরুদ্ধে। তুচ্ছ একটা সাংসারিক সুবিধের জন্য যারা ধর্মত্যাগ করতে পারে তারা কি মানুষ ? হিটলার এমন কী অন্যায় করেছিলেন! ···আশা করি নাতালীর অপরাধ পুরোপুরি প্রমাণ করতে পেরেছি ?' ঘৃণায় বেঁকে গেলো লোকেনবাবুর মুখটা, ঠোঁটের কোণে থুতু জমা হ'লো। একটু দম নিয়ে আবার বললেন, 'আমরা কি এই মুক্তিগ্রামে দেশদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের আশ্রয় দেবো ? যারা নিজের দেশ ছেড়ে চ'লে যায় তারা যে কী-রকম মানুষ হয় তার চমৎকার পরিচয় তো নবেন্দু গুপ্তই দিয়ে গেছেন। এতেও কি শিক্ষা হয়নি আমাদের ? আর যেখানে একজন ভারতীয়ের অন্ন জোগাতে পারি সেখানে একজন বিদেশীকে রাখাই কি উচিত আমাদের ? বহু ভারতীয় মেয়ে নার্সিঙে অভিজ্ঞ হয়েছে আজকাল। আর ঐ ছবি-আঁকার ক্লাশের জন্য একজন হোল-টাইম পুরুষ শিক্ষক চাইলেই পাওয়া যাবে—এমন কেউ, যিনি বড়ো ছেলেদেরও

কিছু আর্ট-এডুকেশন দিতে পারবেন—যেখানে সবাই পুরুষ সেখানে একজনমাত্র মহিলা রাখাও কিছু কাজের কথা নয়। আপনাদের ডাক্তার-সাহেবকেও ধন্য—ও-রকম একটা মেয়েকে আবার আদর ক'রে বাড়িতে রেখেছেন—"like son, like father." '

আমি উত্তেজিত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ছেড়ে, মাথার চুল টানতে-টানতে মেঝেতে পাইচারি করলাম দু-বার। 'না—না—হ'তে পারে না, নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে কোথাও!' লোকেনবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ দিয়ে বিদ্ধ করলাম তাঁকে। 'কী ক'রে জানলেন আপনি এ-সব?'

'ডাক্তার মুখার্জিই বলেছেন।'

'তিনি কী ক'রে জানলেন?'

'আপনিই না একটু আগে বললেন যে মুক্তিগ্রামে প্রাইভেসি ব'লে কিছু নেই?'

'কিন্তু সিক্রেসিও নেই কি?'

'তাও নেই। আমরা কি অনেকদিন আগেই জেনে যাইনি যে নবেন্দু গুপ্ত মার খাবেন? তিনি বিশ্বাস করেননি, আপনিও করেননি—কিন্তু দেখলেন তো।'

হঠাৎ দুর্বল মুহূর্তে ব'লে ফেললাম, 'চারদিকের এত কথাবার্তা শুনে মাথা-খারাপ হ'য়ে যায় এখানে!'

'সেটাই তো অভিপ্রেত—ঠিক সেটাই! এখানে কারো কোনো কথা বলবার বাধা নেই, যার যা খুশি তা-ই বলছে সবাই; সত্যাসত্যে ভেদ মুছে দিয়ে ভ্রান্তি আর পাগলামি সৃষ্টি করতে হ'লে সেটাই তো উপায়!'

'কিন্তু কার অভিপ্রেত? এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? আর তাতে লাভই বা কী?'

'দায়ী?' ভাঙা গলায় হী-হী ক'রে হাসলেন লোকেনবাবু, হাঁপানির

টানের মতো নিশ্বাস শোনা গেলো তাঁর। 'দায়ী আপনি—দায়ী আমি—দায়ী আমরা প্রত্যেকে। ছেলেবেলায় পড়েননি ?—

"আপনারে ল'য়ে বিব্রত থাকিতে
আসে নাই কেহ অবনী-'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"—

মুক্তিগ্রামের সিংহদ্বারে এই মহৎ বাণীটি অদৃশ্য অক্ষরে অঙ্কিত আছে তা আপনি দেখতে পাননি ? আর সেইজন্যেই, লক্ষ করেছেন তো, এখানকার অধিকাংশ শিক্ষকই অবিবাহিত ?'

আমার মনে পড়লো এই ব্যাচিলার্স কোয়ার্টার্সে ফ্ল্যাট খালি থাকে না, তাছাড়া অন্য বাড়িগুলোতে বিবাহিতের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু বটব্যালের দুটো কথার মধ্যে সম্বন্ধ বুঝতে না-পেরে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকালাম তাঁর দিকে।

'যেখানে "সকলের তরে সকলে আমরা" সেখানে বিয়ে করতে কার সাধ যায় বলুন ? আশ্রমের সন্ন্যাসীরা কি বিয়ে করেন ? জেলের কয়েদিরা কি বিয়ে করে ? একটা মস্ত বড়ো কড়াইতে খিচুড়ি পাকানো হচ্ছে—আমরা তালগোল পাকিয়ে টগবগ করছি তার মধ্যে, কেউ সরু আতপ, কেউ মোটা বালাম, কেউ খেঁসারি, কেউ সোনামুগ—সব এক সঙ্গে ! এখানকার স্টাফে কত ঘন-ঘন অদলবদল হয় তা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন ?'

একটু চিন্তা ক'রে জবাব দিলাম, 'আমি তো মাত্র দেড় বছর আছি—'

'এই দেড় বছরেই দু-জন চ'লে গেছেন, দু-জন নতুন এসেছেন। দু-বছর, তিন বছর—তার মধ্যে অনেকেই চ'লে যায়। পাঁচ বছরের বেশি এখানে আছেন, এমন শিক্ষক ষাট জনের মধ্যে দশ জনও পাবেন কিনা সন্দেহ। অবশ্য অনাদ্যন্ত বটব্যালের কথা আলাদা।' একটা

অদ্ভুত মুখভঙ্গি করলেন লোকেনবাবু। 'আপনার কখনো মনে হয়নি এ-রকম কেন হয় ?'

'না—আমি ঠিক—ঠিক চিন্তা করিনি এ-বিষয়ে।'

'অথচ এখানে মাইনে ভালো,' লোকেনবাবু নিজেও ঐ 'কেন'র কোনো উত্তর দিলেন না, 'বেসিক দু-শোতে আরম্ভ হয় এমন কলেজই বা ক-টা আছে সারা দেশে ? বাড়ি ভালো, লাইব্রেরি ভালো, শস্তায় থাকা যায়। আপনার মতো সদ্য-পাশ-করা টগবগে যুবকরা লাফিয়ে ছুটে আসে। কিন্তু ছ-মাস পরেই মীইয়ে আসে তারা, এক বছর শেষ না-হ'তেই দিগ্বিদিকে অ্যাপ্লিকেশন পাঠাতে আরম্ভ করে।'

আমার হঠাৎ মনে পড়লো একটু আগে বেণীমাধবের মুখে যা-কিছু শুনেছিলাম। এঁরা দু-জন একেবারে উল্টোউল্টি মানুষ, কেউ কাউকে পছন্দ করেন না, অথচ এঁরা কি একই রকম কথা বলছেন না, একই রকম ছবি আঁকছেন না মুক্তিগ্রামের ?

'যত ভালোই হোক, এটা একটা স্কুল,' একটা কারণ দেখাবার চেষ্টা করলাম আমি, 'আর পুরোদস্তুর কলেজে পড়াবার ইচ্ছেটা তো স্বাভাবিক।'

'কিন্তু এরা কোথায় যায় জানেন ? আসামের মফস্বলে, বিহারের মফস্বলে, বর্ধমান জেলার গ্রামের কলেজে—যার ভাগ্য খুব ভালো বা ডিগ্রির জোর আছে সে কলকাতার কোনো পাইকেরি কলেজে দু-শো ছাত্রের কাছে সপ্তাহে একুশ ঘণ্টা চীৎকার ক'রে মাসান্তে দেড়শো টাকা পকেটে নিয়ে বাড়ি ফেরে। এই আত্মত্যাগ একটু আশ্চর্য মনে হয় নাকি আপনার ? "এখানে ক-দিন আছি ঠিক কী ? এখন বিয়ে ক'রে কাজ নেই"—এই মনোভাব একটু আশ্চর্য নয় কি ?'

আবার আমার মনে পড়লো বেণীমাধবকে। তাঁর কলকাতার চাকরি, তাঁর বিবাহের পরিকল্পনা।

'আর এখন—এই নবেন্দু গুপ্তর ব্যাপারের পরে—একেবারে

হিড়িক প'ড়ে গেছে চারদিকে। স্যুটকেস গুছিয়ে ব'সে আছে সবাই। বাইরে সবই ঠিকমতো চলছে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে প্রায় প্রত্যেকেরই স্যুটকেস গোছানো। খুব অপ্রত্যাশিত অদল-বদল দেখতে পাবেন শিগগিরই।'

আমি হঠাৎ ব'লে ফেললাম, 'হ্যাঁ – বেণীমাধববাবু বললেন তিনি কলকাতায় চ'লে যাচ্ছেন।'

'বেণীমাধব! ঐ নরাধমের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো আপনার?' হেলানো চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসলেন বটব্যাল, তাঁর কাঁধের হাড় দুটো উঁচু হ'য়ে উঠলো, গর্তে-বসা চোখ দুটো বেরিয়ে এলো ড্যাবড্যাব ক'রে। আমি জবাব দেবার জন্য মুখ খুললাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবার আগেই গিলে ফেললাম কথাগুলো। হঠাৎ দরজার কাছে দু-তিনজন আগন্তুককে দেখা গেলো।

'আসতে পারি, স্যর ?'

ছাত্রদের সঙ্গে সদালাপ করার মতো মনের অবস্থা ঠিক ছিলো না তখন, তবু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা ক'রে বললাম, 'এসো।'

পর্দা ঠেলে এগিয়ে এলো কানাই তরফদার, বলরাম ব্যানার্জি আর শঙ্কর সিং। আমাদের দু-জনকে আলাদা-আলাদা নমস্কার ক'রে দাঁড়ালো তারা। 'ওরা কি এই এলো ? না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছিলো আমাদের কথা ?' বিদ্যুদ্বেগে এই ভাবনাটা খেলে গেলো আমার মাথায়।

'কোনো কথা আছে ?' চেষ্টা ক'রেও অভ্যর্থনার সুর বের করতে পারলাম না।

গম্ভীরমুখে মাথা নাড়লো বলরাম। সেকেণ্ড ইয়ারের ছেলে, ছাত্রদের মধ্যে পাণ্ডাগোছের, অধ্যাপকদের সঙ্গে ব্যবহারে সৌজন্যের অভাব নেই, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে একটু পিঠ-চাপড়ানো ভাব আছে। 'ব্যস্ত আছেন, স্যর ?'

'ঠিক ব্যস্ত না, তবে···তা বলো, কী জন্যে···এই যে, এখানে বোসো,' হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে দিলাম খালি তক্তাপোশটার দিকে।

'এক্ষুনি চ'লে যাবো আমরা, বসবো না,' এবার কথা বললো তরফদার। এই ছেলেটি দেখতে ভারি ভালো, আঠারো বছর বয়সেও পনেরো-ষোলোর বালক-ভাবটা মিলোয়নি, ক্ষুর-না-চালানো গালের উপর প্রথম নরম দাড়ির ছায়া পড়েছে। একবার আমার দিকে, একবার বটব্যালের দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'প্রোফেসর গুপ্তর ব্যাপারটা নিয়ে যে-এনকোয়ারি হবে আমরা সে-বিষয়ে আপনাদের কাছে জানতে এসেছি।'

'এনকোয়ারি ?' আমি চমকে উঠলাম কথা শুনে, কিন্তু পরক্ষণেই সাবধান হ'য়ে ঠাণ্ডা গলায় বললাম, 'এনকোয়ারি হবে নাকি ?'

'শোনেননি আপনারা ?'

'না, শুনিনি।'

'আমরা তো সন্ধেবেলাই শুনেছি ; ডক্টর চৌধুরীকে যে-রিসেপশন দেয়া হ'লো সেখানেই নাকি জানানো হয়েছে ?'

'সেখানে ? না তো।'

'তাহ'লে মীটিঙের পরে হবে আরকি,' একটুও দ্বিধা না-ক'রে জবাব দিলে বলরাম।

'খবরটা কোথায় শুনলে তোমরা ?'

'সকলেই জানে।' আর-কিছু না-ব'লে বলরাম ঈষৎ করুণার চোখে আমার দিকে তাকালো, যেন বলতে চায় : 'সারা ক্যাম্পাস যা জানে আপনারা প্রোফেসর হ'য়ে এখনো তা জানেন না ?' বলিষ্ঠ ছেলে ; একটু বেঁটে হ'লেও চমৎকার চওড়া, স্বাস্থ্যে চিকচিক করছে গালের চামড়া। আমি তার দিকে না-তাকিয়ে বললাম, 'এনকোয়ারি হ'লে তো ভালোই হয়।'

'ঠিক বলেছেন, স্যর,' মূর্তির মতো সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে জবাব দিলে বলরাম। 'তবে কী জানেন, এর অন্য একটা দিকও আছে। লোকেরা সব ভুলে গিয়েছে এতদিনে, আবার কেলেঙ্কারি ঘাঁটিয়ে তুলে লাভ কী।'

বিরক্ত হলাম কথা শুনে, ছোকরার মুরুব্বিয়ানার সুর ভালো লাগলো না। কথাবার্তাটাকে সমাপ্তির দিকে নিয়ে যাবার সুরে বললাম, 'তা এ-ব্যাপারে তো আর কারো কিছু করবার নেই ; তোমরা বরং সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা ক'রে—'

'সেক্রেটারিরই অর্ডার এটা,' আমার কথার মাঝখানেই সুন্দর চেহারার কানাই তরফদার ব'লে উঠলো। 'আর তাঁর উপর কথা

বলতে পারেন এক প্রেসিডেন্ট। তা প্রেসিডেন্টও বদল হচ্ছে, শুনলাম।'

'বদল হচ্ছে?' ছাত্রদের সামনে বিশ্রী বোকা মনে হ'লো নিজেকে।

'সকলেরই মত, যমুনাদাস অনেক বেশি উপযুক্ত হবেন তাঁর খুড়োর চেয়ে।'

'সকলের মত শুনতে চাই না। তোমাদের আর-কিছু বলবার থাকে তো বলো। দেখছো ব্যস্ত আছি।'

আমার রাগি স্বরে যুবকেরা একটু বিচলিত হ'লো; বলরাম ডান পা থেকে বাঁ পায়ে তার শরীরের ভার বদলি করলে। শঙ্কর সিং একটু আড়ালে ছিলো এতক্ষণ; এইবার এগিয়ে এসে মোটা গলায় বাঁকা উচ্চারণে বললে, 'শুনছি আমাদের রাস্টিকেট করা হবে?'

'কেন? তোমরা কি কোনো দোষ করেছো?'

'না, স্যর, সে-কথা নয়,' শঙ্কর সিং-এর শার্টের কাঁধে আস্তে টান দিলে বলরাম। 'আমাদের কোনো দোষ ধরবেন না, স্যর; আমরা যা শুনেছি তা-ই বলছি। এনকোয়ারি হবে; ছাত্রদের মধ্যে কেউ দোষী বলে প্রমাণ হ'লে রাস্টিকেট করা হবে তাদের; আর যদি প্রমাণ হয় প্রোফেসর গুপ্তর উপর অবিচার হয়েছে তাহ'লে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হবে। কিন্তু কোনো প্রোফেসর দোষী সাব্যস্ত হ'লে কী ব্যবস্থা হবে সে-বিষয়ে কিছু শুনিনি এখনো।'

দাড়ি-না-ওঠা সুন্দর যুবকটির মুখে শেষের কথাটা শুনে আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ ক'রে উঠলো। কঠিন গলায় বললাম, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু এ-সব কথা শোনার আমার সময় নেই।'

'আমরা আপনাদের ছাত্র। বিপন্ন হ'য়ে এসেছি। আমাদের সাহায্য করবেন না?'

'বিপন্ন কেন?'

'আপনি তো আমাদের জানেন, স্যর,' পাঞ্জাবি ছেলেটি অদম্য-

ভাবে ব'লে উঠলো। 'পড়াশুনোয় রেকর্ড আমাদের খারাপ নয়। বাবারা বড়ো-বড়ো চাকরি করেন। আমাদের পরীক্ষার বছর এটা— পাশ ক'রে কেউ ইংলণ্ডে কেউ জর্মানিতে যাবো ঠিক হ'য়ে আছে। এখন হঠাৎ যদি বাবারা খবর পান স্কুল থেকে আমাদের নাম কাটা গেছে—'

'তুমি চুপ করো তো হে!' শঙ্কর সিংহকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলো বলরাম। 'শঙ্কর সিং-এর কথায় কিছু মনে করবেন না, স্যর—ওর বাবা বড্ড স্ট্রিক্ট গার্ডিয়ান কিনা, তাই একটু বেশি ভয় পেয়েছে।'

'কিন্তু তোমরা যদি কোনো দোষ না-ক'রে থাকো তাহ'লে তোমাদের ভয় কিসের?'

হঠাৎ সুন্দর চেহারার তরফদার বললে, 'দোষ করলেই কি শাস্তি হয় সব সময়, আর না-করলেই কি হয় না?' চকিতে তার চোখে আমার চোখ পড়লো; একটা সূক্ষ্ম হাসি সেখানে ফুটে উঠে মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

'যদি কাউকে শাস্তি দেয়া হবে স্থির ক'রে নিই তাহ'লে তার দোষ বের করতে কতক্ষণ লাগে? আপনি, স্যর, আপনাকে জিগেস করি— আপনি কি প্রোফেসর গুপ্তকে অপরাধী বলবেন? তাঁকে কেন শাস্তি পেতে হ'লো?'

এই যুবকদের মুখে এ-সব যুক্তি শুনে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। মিনিটখানেক চুপচাপ কাটলো।

'কয়েকজন বাছা-বাছা ছাত্র আর প্রোফেসরকে ডেকে নিয়ে জেরা করা হবে। এই প্রসঙ্গে আপনার নাম উল্লিখিত হ'তে শুনেছি আমরা। এখন কথা হচ্ছে: আপনি কী বলবেন তাঁদের কাছে গিয়ে?'

রাগে চিড়বিড় ক'রে উঠে বললাম, 'যা জানি তা-ই বলবো। যা সত্য ব'লে জানি তা-ই বলবো। তোমরা এখন যেতে পারো।'

আমার শেষ কথাটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে বলরাম বললে, 'তার মানে—আপনি বলবেন, আমরা এই তিনজন মারের দলের সর্দার ছিলাম ?'

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'তা-ই ছিলে নাকি তোমরা ?'

'অন্তত সারা মুক্তিগ্রাম তো তা-ই জানে।'

'কিন্তু কথাটা সত্যি ?'

'সত্যি ব'লেই ধ'রে নিন। ধরুন আমরা কনফেস করছি আপনার কাছে। অভিজিৎবাবুর ঘরের তালা খুলে মালতী ঘোষের চিঠি আমরাই চুরি করেছিলুম। আমরাই দলবল জুটিয়ে রক্তপাত করেছিলুম নবেন্দু গুপ্তর। ধ'রে নিন সবই সত্যি। কিন্তু কেউ দেখেছিলো ? প্রমাণ আছে কোনো ? ঐ অন্ধকারে আর গোলমালে আমাদের রুমালে-বাঁধা মুখগুলো চিনতে পেরেছিলো কেউ ? শপথ ক'রে কেউ বলতে পারবে আমরা তিনজনই প্রধান অপরাধী ? আপনি পারবেন ?'

'তাছাড়া প্রধান অপরাধীও নই আমরা !' মেঝেতে পা ঠুকে শঙ্কর সিং ব'লে উঠলো। 'হাতে আমরা মেরেছি বটে, কিন্তু বুদ্ধি আরেক জনের। যদি সত্যিকার এনকোয়ারি করতেই চান ওঁরা, তাহ'লে আমরা দাবি করবো—'

'একটু আস্তে, শঙ্কর সিং, আস্তে। মাথা গরম কোরো না,' নিচু গলায় কথা বললো কানাই তরফদার। 'স্যর, আপনি বিরক্ত হচ্ছেন বুঝতে পারছি; কিন্তু যদি অনুগ্রহ ক'রে আর দু-মিনিট সময় দেন, সত্যি কথাটা আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই।'

'আমাকে জানিয়ে কী লাভ। এনকোয়ারির সময় যথাস্থানে সত্য কথা বোলো, তাহ'লেই হবে।'

'আপনি তাহ'লে আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ?'

আবার আমি জবাব খুঁজে পেলাম না। এইটুকু বয়সে এমন শয়তানি যুক্তি এরা শিখলো কোথায়? এখন এরা যা বলছে তাও কি বেণীমাধব শিখিয়ে দিয়েছে এদের?

'কারো বিরুদ্ধে কিছু বলার উপদেশ আমি দিচ্ছি না। কোনো উপদেশই দিচ্ছি না।'

'কিন্তু সত্য বলবো তো? আর সত্যটা তো এই যে সব-কিছুই আমাদের দিয়ে করিয়েছেন মিস্টর দাস—বেণীমাধব দাস! ডাকঘর থেকে চিঠিপত্র সরিয়ে ফেলা তাঁরই কীর্তি। মালতী ঘোষকে বেনামি চিঠি লেখা তাঁরই কীর্তি। আর ঐ মারের ব্যাপারটায়—দিনক্ষণ তারিখ ঘটনাস্থল সবই তিনি ঠিক ক'রে দিয়েছেন; প্রোফেসর গুপ্তকে রীতিমতো সঁ'পেও দিয়ে গেছেন আমাদের হাতে। তর্ক তুলে, গল্প জমিয়ে, কথা বলিয়ে-বলিয়ে প্রোফেসর গুপ্তকে তিনি এগিয়ে দিয়ে গেলেন মহেশ্বরের মাঠ পর্যন্ত, ব'লে দিলেন, "এই মাঠের উপর দিয়েই চ'লে যান, কাছে হবে"—আর তারপর, আমরা যতক্ষণে ঐ বুড়ো মানুষটার উপর এলোপাথাড়ি কিল চড় ঘুষি চালাচ্ছি, ততক্ষণে তিনি নিজের বাড়ি গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে গরম ভাত আর মুর্গির ঝোল খেতে বসেছেন। এখন বলুন, দোষ কার—সত্যিকার অপরাধী কে?'

'দোষ করেছি, আমরাও দোষ করেছি,' হঠাৎ আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো শঙ্কর সিং, 'হাজার বার মানছি সে-কথা! হাজার বার ক্ষমা চাচ্ছি! আমরা ছিলুম দশ জন, তিনি একলা। অন্যেরা শুধু পাহারার কাজ করেছে—আসল কাজ আমরা, এই তিন জন। মোটা লাঠিটা তুলে প্রথমে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন, মুহূর্তে কোথায় উড়ে গেলো লাঠি; মার খেতে-খেতে, যুঝতে-যুঝতে শেষটায় প'ড়ে গেলেন মাটিতে, চীৎকার ক'রে ছুটে এলেন নাতালী দে, আমরা ঐ প'ড়ে-যাওয়া আধ-মরা বুড়োমানুষটাকে মাড়িয়ে, লাথি মেরে, অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। ভগবানের অনেক দয়া তিনি ম'রে যাননি!' দুই

হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালো শঙ্কর সিং, তারপর হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

'ন্যাকা! ভিতু কোথাকার! ইডিয়ট!' চাপা গলায় ফোঁশ ক'রে উঠলো তরফদার। পাথরের মতো মুখ ক'রে বলরাম তাকিয়ে রইলো অন্য দিকে। আমি শঙ্কর সিংকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রঘুকে বললাম এক গ্লাশ জল আনতে। জল খেয়ে একটু সুস্থ হ'লো সে, কাতরভাবে আমার দিকে তাকালো।

তখন আমি বললাম, 'একটা কথা জিগেস করি; তোমাদের তিনজনকেই জিগেস করছি। কেন করেছিলে তোমরা ও-কাজ? প্রোফেসর গুপ্তর উপর কী-আক্রোশ ছিলো তোমাদের?'

'কিছু ছিলো না।'

'কিছু না? তা হ'তে পারে না, বলরাম। অসহ্য রাগ না-হ'লে ও-রকম করতে পারে না কেউ। আবার ভাবো। বলো। মন খুলে বলো। ভয় পেয়ো না। আমি কোনো শাস্তি দিতে পারি না তোমাদের, হয়তো কোনো ভালো করতেও পারি না। আমি শুধু জানতে চাই।'

'তিনি থাকতেন ডাক্তার মুখার্জির বাড়িতে,' বলরামই জবাব দিলো আবার, 'প্রায়ই নাতালীদির সঙ্গে তাঁকে বেড়াতে দেখা যেতো।'

'এর জন্যে আক্রোশ?'

'আর মালতী ঘোষ প্রায়ই আসতো সে-বাড়িতে। আমাদের হিংসে হ'তো।'

'প্রোফেসর গুপ্তকে? না, অভিজিৎবাবুকে?'

'দু-জনকেই।'

'কিন্তু দু-জনের মধ্যে ষাট বছরের বৃদ্ধকেই বেছে নিলে কেন?'

'যা জানেন সে-কথা আর জিগেস করেন কেন, স্যর?' ক্লান্ত, বুড়োটে গলায় টেনে-টেনে কথা বললো আঠারো বছর বয়স্ক কানাই

তরফদার। 'সারা মুক্তিগ্রামে তখন—আপনারা দু-একজন ছাড়া—কে না ঘৃণা করেছে নবেন্দু গুপ্তকে? কে সহ্য করতে পেরেছে তাঁর অদ্ভুত ভাবভঙ্গি, আরো অদ্ভুত কাপড়চোপড়? নিচু ক্লাশের বাচ্চা ছেলেরাও ক্লাউন বলতে শিখেছিলো তাঁকে, পথে দেখলে পিছনে প'ড়ে হাততালি দিয়েছে। চল্লিশ বছর বিদেশে কাটিয়ে তিনি কি দেশাত্ম-বোধে জলাঞ্জলি দেননি? তাঁর রুগ্ন জর্মান স্ত্রীকে কি অনাহারের মুখে ফেলে আসেননি ইংলণ্ডে? বলেননি কি, নয়া দিল্লির ন্যাশনাল ম্যুজিয়মে যত ছবি আছে সব একত্র করলেও প্যারিসের একটা ছোটো ম্যুজিয়মের একটা ছোটো ঘরের সমান হয় না? স্বদেশের এত বড়ো অপমান, বিদ্যাপীঠের ঐতিহ্যের উপর এত বড়ো অত্যাচার আমরা সহ্য করি কী ক'রে? যা আমরা করেছিলাম, তা আমাদের আদর্শকে বাঁচাবার জন্যই। একটা উদাহরণ রইলো এখানে, আর-কেউ সেই আদর্শ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সাহস পাবে না। সব জেনে-শুনেও কর্তৃপক্ষ কি শাস্তি দেবেন আমাদের? আপনার কী মনে হয়?'

'তোমরা যদি বিচারক হ'তে তোমরা কী করতে?'

'আমরা?' বাঁকা হাসলো কানাই তরফদার, 'আমাদের যিনি নাচিয়েছেন সেই বেণীমাধববাবুকে অন্য রকম নাচ শিখিয়ে ছেড়ে দিতাম।'

'কোনো প্রমাণ আছে?'

'না। আদালতে যাকে প্রমাণ বলে তা নেই। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধেই কি প্রমাণ আছে কিছু?'

'তাহ'লে ধ'রে নাও কিছুই হবে না।'

'তা-ই বা ধ'রে নিই কেমন করে?' চাপা গলায় বলরাম বললে। 'আমাদের আসল ভয়টা কোথায় জানেন? যদি বেণীমাধববাবুই নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের জবাই করেন? তিনি পারেন না এমন কিছু তো নেই। আর তিনি প্রোফেসর, আমরা শুধু ছাত্র;—

তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কথা কি কানে তুলবেন ওঁরা? তার উপর ওঁদের হয়তো একটু সহানুভূতিও আছে তাঁর উপর। প্রোফেসর গুপ্ত কি একবার লাঠি নিয়ে তাড়া করেননি বেণীমাধববাবুকে—ঠিক তা না-ক'রে থাকুন, মেঝেতে লাঠিটা ঠুকেছিলেন তো। এ-অবস্থায়—'

'এ-অবস্থায় তাঁকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা আমাদের নিজেদের হাতেই নিতে হবে,' বলতে-বলতে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো শঙ্কর সিং। 'আমাদের যা হয় হোক পরোয়া করি না, কিন্তু ঐ বেণীমাধব দাসটাকে—'

'চুপ করো!' ধমকের সুরে ব'লে উঠলো বলরাম। 'মস্ত একটা শরীরই আছে তোমার—মগজে এক ছিটে বুদ্ধি নেই!'

'কেন? চুপ করবো কেন? আমি শাদাশিধে পাঞ্জাবি, গায়ে জোর আছে, তোমাদের ঘিনঘিনে প্যাঁচালো বাঙালি বুদ্ধির ধার ধারি না। ঐ বুদ্ধির কেরামতি কতদূর তা তো দেখলাম। ঝাঁটা মারি ঐ বুদ্ধির মুখে, থুতু ফেলি তোমাদের মগজে। ভেবো না আমি সহজে ছেড়ে দেবো; তোমরা সবাই যদি ভয় পেয়ে স'রে দাঁড়াও আমি একা দেখে নেবো তোমাদের মগজওলা বেণীমাধবকে—ওর ঠ্যাং ভেঙে দিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখবো ছ-মাস, তারপর খোঁড়া হ'য়ে বাকি জীবন শঙ্কর সিং-এর নাম ও ভুলতে পারবে না—তার জন্য আমাকে জেলে যেতে হয় তাও রাজি!'

দু-জনে দু-দিক থেকে চেপে রেখেও সামলাতে পারলে না শঙ্কর সিংকে, চীৎকার ক'রে কথা শেষ করলে সে, তারপর এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো দরজা দিয়ে। অন্য দু-জন, কোনোরকম বিদায় না-নিয়ে, আমাদের দিকে আর দৃষ্টিপাতমাত্র না-ক'রে, তার পিছু নিলে।

॥ এগারো ॥

'চমৎকার প্রহসন! চমৎকার! বেশ লাগলো দৃশ্যটি দেখতে।'

আমি প্রায় ভাবছিলাম ছেলেদের পিছন-পিছন বেরিয়ে যাই, তাদের ঘরে ডেকে আরো ছুটো কথা বলি, কিন্তু ভাঙা গলার আওয়াজ শুনে থেমে গেলাম। সেই চেয়ারটিতেই ব'সে আছেন লোকেন বটব্যাল, গা এলিয়ে, লম্বা ঠ্যাং ছুটোকে উঁচু ক'রে গুটিয়ে এনে—যাতে কিনা হাঁটু ছুটো তাঁর মাথা ছাড়িয়ে উপরে উঠে ছিলো। এই অদ্ভুত ভঙ্গিটি তিনি কখন অবলম্বন করেছিলেন লক্ষ করিনি, হয়তো এই 'প্রহসনে'র দর্শক হিশেবে নিজেকে আড়ালে রাখার জন্য এই তাঁর স্বোদ্ভাবিত উপায়। এতক্ষণে আমার মনে পড়লো যে ছেলেদের কথার মধ্যে একটিও কথা তিনি বলেননি; আর ছেলেরাও, প্রথম-প্রথম তথ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত 'আপনারা' ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকলেও একটু পরেই বহুবচনের ব্যবহার ত্যাগ করেছিলো, আর শেষের দিকে, তাদের উত্তেজনায় বিচলিত হ'য়ে, আমি সুদ্ধু লোকেন-বাবুর অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলাম। একটু খারাপ লাগলো নিজের এই অন্যমনস্কতায়; মনে হ'লো এ-ব্যাপারে তাঁর মতো বিচক্ষণ ও প্রবীণ ব্যক্তির পরামর্শ না-নিয়ে ভালো করিনি।

কিন্তু সুখের বিষয়, পরামর্শ নেবার সময় এখনো চ'লে যায়নি। সামনে থেকে তাঁর হাঁটু ছুটো শুধু দেখা যাচ্ছে, মুখ দেখার জন্য আমি ঘুরে গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। এ-সব কথাবার্তা শুনে তিনি যে অবাক হয়েছেন বা চঞ্চল হয়েছেন বা ক্ষুব্ধ হয়েছেন এমন কোনো লক্ষণ নেই তাঁর মুখে;—শুধু, যেমন সাধারণত হ'য়ে থাকে, ঈষৎ ব্যঙ্গের ভাবে তাঁর ঠোঁটের কোণ বেঁকে আছে।

আমি বললাম, 'আপনি কিছু বললেন না যে?'

'কিছু বলার নেই।' লোকেনবাবু, যেন আমার অসুবিধেটা বুঝতে পেরে, হাঁটু নামিয়ে নিলেন, এবার তাঁর মুখ অনায়াসে দেখা গেলো। 'আপনি ছেলেমানুষ, তায় ভালোমানুষ, তাই অতক্ষণ ধৈর্য ধ'রে ওদের কথা শুনলেন, আমি হ'লে ছুটো কথার পরেই হাঁকিয়ে দিতুম।'

'কিন্তু ছেলেরা যা ব'লে গেলো তা কি সত্যি? সত্যি কি এনকোয়ারি হবে?'

'আপনি কী হ'লে সুখী হন? এনকোয়ারি হ'লে, না, না-হ'লে?

'যদি ব্যাপারটা নিয়ে ভালো ক'রে অনুসন্ধান করা হয়, আর তাতে বেরিয়ে আসে যে নবেন্দু গুপ্তর উপর গুরুতর অবিচার করা হয়েছে—'

হা-হা ক'রে খোলা গলায় হেসে উঠলেন লোকেনবাবু। মাথা নেড়ে বললেন, 'বৃথাই ইতিহাস পড়েছেন, তাপসবাবু, বিশ শতক বুড়ি হ'তে চললো তবু তাকে চিনতে পারলেন না। এ-যুগের ড্রেফ্যুসদের আর ফিরিয়ে আনা হয় না, তাদের পঞ্চভূতে বিলীন ক'রে দেয়া হয়। আমরা বাঙালিরা কিছুটা অপটু ব'লেই নবেন্দু গুপ্তর দেহ আর আত্মা এখনো সহবাস করছে।'

'আপনার রসিকতা আমার ভালো লাগছে না, লোকেনবাবু। আমি ভাবছি—'

'আপনার ভাবনার জবাব এক কথায় দিয়ে দিচ্ছি আমি। অনু-সন্ধান হবে, আর তার ফলে এটাই প্রমাণ হবে যে নবেন্দু গুপ্ত রীতি-মতো অপরাধী; তাঁর প্রতি বিদ্যাপীঠ কোনো অন্যায় করেনি, আর তাকে যারা মেরেছিলো তারা বিদ্যাপীঠের কেউ নয়।'

'তাছাড়া আর কারা হ'তে পারে?'

'বাঃ, শোনেননি সেই থিওরি? নবেন্দু গুপ্ত মাঝে-মাঝে রানীগঞ্জে যেতেন এক কয়লা-খনির অফিসারের বাড়িতে; সেই ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রীর প্রতি গুপ্তর মনোযোগে অতিষ্ঠ হ'য়ে, গুণ্ডা লাগিয়েছিলেন তাঁকে একটু শিক্ষা দেবার জন্য।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'কে বিশ্বাস করবে এই গাঁজাখুরি গল্পে?'

'বিশ্বাস করবার মতো লোকের অভাব নেই, যাঁরা করাতে পারেন তাঁরাও হাতের কাছেই উপস্থিত। একমাত্র বাধা হ'তে পারতেন লীলা-রামজী, তা সেইজন্যেই তাঁকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। বেণীমাধব দাস আবার তিনটে স্পেশাল আর্টিকেল লিখবে—আড়ে-ঠারে, মানহানি ইত্যাদির ঝামেলা বাঁচিয়ে; প'ড়ে বাংলাদেশের ভদ্রমহোদয়গণ নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্ত্রীকে নিয়ে পুজোর জামা-কাপড় কিনতে বেরোবেন। বিদ্যা-পীঠের যে "ভিতরে কোনো গোলযোগ" নেই, এই এনকোয়ারি হবে তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ। প্রহসন! ফার্স! সোজা বাংলায় যাকে বলে ধাপ্পা! বুঝেছেন?'

বটব্যালের কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে সময় লাগলো আমার। একটু পরে বললাম, 'কিন্তু তা-ই যদি, আপনি ছেলেদের বললেন না কেন সে-কথা?'

'আপনি কি চাচ্ছিলেন ঐ গুণ্ডাগুলোকে আমি সান্ত্বনা দিই? আদর ক'রে বলি, "বাপু হে, বাড়ি যাও, কিছু ভয় নেই তোমাদের"?'

'কিন্তু ওরা যদি আবার বেণীমাধববাবুর—'

'ঠ্যাং ভেঙে দেয়?' নিঃস্বর আওয়াজে অনেকক্ষণ ধ'রে হাসলেন বটব্যাল, তাঁর মুখের চামড়া কুঁচকে গেলো। আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে বললেন, 'তাহ'লে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো বেণীমাধবের? বললে, কলকাতায় চ'লে যাচ্ছে?'

'তা-ই বললেন।'

'আর?'

আমি বেণীমাধবের সঙ্গে আমার কথাবার্তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম। কলকাতায় তাঁর দুটো চাকরি, মালতী ঘোষকে বিয়ে করার সম্ভাবনা, ভবিষ্যতের জন্য তাঁর উচ্চাশা— কিছুই বাদ গেলো না। শুনে

অবাক হলেন না লোকেনবাবু, আহত হলেন না, শুধু তাঁর শীর্ণ মুখের অসংখ্য রেখাগুলো কৌতুকে আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

'মালতী ঘোষকে বিয়ে করছে বেণীমাধব? ঠিক আছে—ও-সব অতিরোমান্টিক মেয়েদের ও-রকমই গতি হয় শেষ পর্যন্ত। ভালোবাসার জন্য যারা মরতে চায় তারা মরতে পায় ঠিকই, কিন্তু কোনো দেবদূত এসে কোলে ক'রে স্বর্গে নিয়ে যায় না তাদের, হুলো বেড়াল চেটেপুটে সাবাড় ক'রে দেয়। তা ঠিক—ঠিক আছে, যার উদ্দেশেই হোক, আত্মোৎসর্গ তো করা হ'লো। এখন অভিজিৎবাবু একটি কালোকেলো গেরস্তঘরের বি. এ. পাশ মেয়ে বিয়ে ক'রে নিন—মুড়িঘন্ট রেঁধে খাওয়াতে পারবে, চাকরি ক'রে সংসারের আয়ও বাড়াতে পারবে, শুধু ছেলেপুলে না-হবার ফিকিরটি শিখিয়ে দিলেই দাম্পত্য জীবনে সুখের আর সীমা থাকবে না।'

লোকেনবাবুর কথা শুনে আমার মাথা হেঁট হ'লো। আস্তে-আস্তে বললাম, 'একটা কথা জিগেস করি, লোকেনবাবু। জীবনে কি কিছু নেই যা আপনি ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, যাকে আপনি অপমান করতে পারেন না?'

'এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই,' রোগা লম্বা শরীর নিয়ে বটব্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য দেখলাম। 'রাত হ'লো, চলি। কিন্তু যাবার আগে আমিও একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। ইচ্ছে না-হ'লে জবাব দেবেন না।'

তাঁকে রাগিয়ে দিয়েছি ভেবে খারাপ লাগলো আমার; গলার আওয়াজে হৃদ্যতা এনে বললাম, 'বাঃ, বলুন।'

'আপনি আছেন কেন এখানে? এই বিদ্যাপীঠে?'

'আছি—মানে, চাকরি তো চাই একটা।'

'কিন্তু আপনার বয়স কম, দায়িত্ব কিছু নেই, ডিগ্রি ভালো—আপনি কেন মরতে এলেন এই শকুনডাঙায়? আপনি তো নন

লোকেন বটব্যাল—যার স্বাস্থ্য নেই, যৌবন নেই, আশা নেই, আছে শুধু পাঁচটা অপোগণ্ড সন্তান আর একমাত্র ভবজলধিরত্নম্ এই চাকরিটুকু! এখান থেকে চ'লে গেলে কে তাকাবে আমার দিকে, কে একমুঠো ভাত দেবে আমার ছেলেমেয়েগুলোকে? বড়ো জোর-একটা স্কুলমাস্টারি জুটবে কোথাও—জাত স্কুল-মাস্টার আমি—আর-কিছুরই যোগ্য নই, এত বড়ো ভারতবর্ষে আর-কোনো উপায় নেই যাতে আমি সাড়ে-চারশো টাকা রোজগার করতে পারি মাসে-মাসে। কিন্তু আপনি—সারা জগৎ খোলা আছে আপনার সামনে, বিপুল জীবন অপেক্ষা করছে আপনার জন্য। আপনি কেন প'ড়ে আছেন গৃধিনীর অরুচি এই বিদ্যাপীঠে?' বলতে-বলতে বীভৎস হ'য়ে উঠলো বটব্যালের মুখ, গলার শির ফুলে উঠলো, গর্তে-বসা চোখ দুটো আক্রোশে চিক-চিক ক'রে উঠলো মুহূর্তের জন্য। 'গৃধিনীর অরুচি! কথাটার মানে বোঝেন? প'চে-গ'লে ঘিনঘিন করছে চারদিক, অথচ শকুনে খেয়ে নিচ্ছে না, মাটিতে মিশে যাচ্ছে না, হাওয়ায় উবে যাচ্ছে না,—আর এমনি ক'রেই টিকে আছে বছরের পর বছর। টিকে থাকবেও! আপনি ভাবছেন তা অসম্ভব? আপনি ভাবছেন গতি এই জগতের নিয়ম—হয় উত্থান নয় পতন, হয় বিকাশ নয় বিলয়—কোনো উপায় নেই স্থির হ'য়ে থাকার—ঋতুর উদাহরণ দেখে, জন্তুর উদাহরণ দেখে, আপনি ভাবছেন এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয় না? ভুল, ভুল! প্রকৃতির নিয়ম প্রাকৃত ব্যাপারেই খাটে শুধু; যা মানুষের তৈরি তার আইনকানুন অন্য রকম। মিশরের সভ্যতা অনড়ভাবে কতকাল টিকে ছিলো? ভারতের বর্ণাশ্রম ফোড়ার মতো রক্তে-পুঁজে পেকে উঠেও ফাটতে কত দেরি করলো জানেন না? তেমনি এই বিদ্যাপীঠ। পচা গলা পিণ্ড হ'য়েও টিকে থাকবে, হয়তো পঞ্চাশ, হয়তো আরো একশো বছর—বাইরের দিকে আরো অনেক উন্নতিও হবে হয়তো—তার মানে ফোড়াটা পেকে-পেকে গলগণ্ড হ'য়ে উঠবে ক্রমশ, বিষাক্ত

কুঁজ হ'য়ে ফুলে উঠবে এই মাটির উপর। বিশ্বাস করছেন না আমার কথা? তবু ভাবছেন যা প'চে গেছে তা লুপ্ত হ'তে বাধ্য? তাহ'লে আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই আপনাকে—দয়া ক'রে একবার ভগবানের কথা ভেবে দেখুন না। ম'রে, প'চে, ভূত হ'য়ে গেছেন ভগবান—তবু কি তিনি টিকে নেই? তবু কি মানুষ বাতিল ক'রে দিতে পারছে তাঁকে, ছাড়াতে পারছে, ভুলতে পারছে? একবার ভগবানকে আবিষ্কার ক'রে, রচনা ক'রে, তারপর হাজার-হাজার বছর ধ'রে নিজের রচনার মোহে কেমন বন্দী হ'য়ে আছে মানুষ তা তো দেখছেন। কেউ টের পাচ্ছে না নিজেদের দুর্গন্ধ, দেখতে পাচ্ছে না নিজেদের মড়াপোড়া চেহারা—তা যদি পেতো তাহ'লে মুহূর্তে বুঝতে পারতো যে ভগবান ম'রে গেছেন, কেননা তিনি থাকলে এ-রকম হ'তে পারতো না।—এর উত্তরে আপনি কী বলেন?'

যুদ্ধঘোষণার ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন বটব্যাল; তাঁর দেহের একমাত্র সুস্থ অংশ, তাঁর ঝকঝকে দাঁতের পাটি ঝলসে উঠলো অস্ত্রের মতো। কিন্তু—যেমন তাঁর এই অসংলগ্ন প্রলাপের মধ্যে অনেকবার বাধা দেবার চেষ্টা ক'রে আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম, তেমনি এখনো কিছু বলতে পারলাম না—শুধু সভয়ে তাকিয়ে থাকলাম তাঁর দিকে, আর মনে-মনে ভাবলাম—ভদ্রলোক পাগল হ'য়ে যাচ্ছেন না তো?

'আমার কথাগুলো আপনার ভালো লাগছে না বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি কারো মনোরঞ্জনের জন্য কথা বলি না। এমনও নয় যে চেষ্টা করলেই মনোরঞ্জন করতে পারি আমি। না, কাউকে খুশি করা আমার ধাতে নেই—আমার চরিত্র সে-রকম নয়, আমার—' এখানে বটব্যালের মুখটা এমন একটা ভঙ্গিতে বেঁকে গেলো যেন তিনি কেঁদে ফেলবেন, কিন্তু আমি বুঝলাম সেটা বিদ্রূপের হাসি—'আমার চেহারাও সে-রকম নয়।' একটু থামলেন তিনি, একবার ঢোক গিললেন।

আস্তে-আস্তে তাঁর মুখে উত্তেজনা কেটে গিয়ে ঘন হ'য়ে অবসাদ নামলো। খুব নিচু, মরা গলায় বললেন, 'আপনাকে বলা বাহুল্য আমি বেণীমাধবেরই আর-একটি প্রকরণ। তেমনি ইতর, পরস্ত্রী-কাতর, ঈর্ষাপরায়ণ। আর প্রায় তেমনি চতুর। তফাৎ শুধু এই যে চতুর বেণীমাধব নিজের উন্নতি অন্তত করতে পারে, বটব্যালের সে-ক্ষমতাও নেই। আর সেই অক্ষমতার জন্যই—চলি।'

আর পরমুহূর্তেই লোকেনবাবুর কুশ্রী লম্বা শরীরটা পিঠ ফেরালো আমার দিকে, যেন ছায়ার মতো পর্দা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেলো। আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মিনিট, তারপর ছুটে গেলাম বাথরুমের দিকে। গলিতে রঘু ঝিমুচ্ছে দেয়ালে ঠেশান দিয়ে, তাকে চীৎকার ক'রে ডাকলাম—'রঘু, খাবার দাও শিগগির।' প্রতি চার-জনের জন্য একটা ক'রে বাথরুম এই ব্যাচিলার্স কোয়ার্টার্সে; সামনেরটা বন্ধ দেখে তার পরেরটায় ঢুকে প'ড়ে ঠাশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিলাম দরজা, ঝর্নার তলায় গা পেতে দাঁড়ালাম, কিন্তু একটু পরেই শীত-শীত করাতে ভিজে গায়ে মাথায় বেরিয়ে এসে তক্ষুনি খেতে ব'সে গেলাম। কিসের এই তাড়া কে জানে; কিন্তু মনে হ'লো কী একটা খুব জরুরি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি, এক সেকেণ্ড নষ্ট করা অসম্ভব। গপগপ ক'রে খানিকটা খেয়ে নিতেই হঠাৎ মনে প'ড়ে গেলো, তাড়াটা কিসের। জলের গ্লাশ নিঃশেষ ক'রে উঠে পড়লাম।

'খেলেন না, বাবু?'

'আমাকে একটু বেরোতে হচ্ছে এক্ষুনি—তুমি শুয়ে পোড়ো, রঘু—আমি দরজায় তালা দিয়ে যাচ্ছি।'

'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, ছাতাটা নিয়ে যান।'

'রেনকোটটা দাও।'

বর্ষাতিটা চাদরের মতো পিঠের উপর ফেলে আমি বেরিয়ে এলাম। টিপটিপ বৃষ্টি—বোধহয় অনেকক্ষণ ধ'রেই হচ্ছে—বটব্যালের সঙ্গে

এমনভাবে ব্যস্ত ছিলাম যে টের পাইনি। রাত অনেক—মানে, ঘড়িতে দশটার বেশি হবে না, কিন্তু বিদ্যাপীঠে দশটাতেই নিশুতি। খুব কম জানলাতেই আলো দেখা যাচ্ছে। এদিকে আকাশেও ভারি মেঘ, চাঁদ নেই, খাঁটি ভাদ্র মাসের বাদলার রাত। কলকাতা থেকে নতুন কেউ এলে ঘুটঘুটে অন্ধকার মনে হ'তো, কিন্তু আমি অভ্যস্তভাবে পা চালালাম।

আলো-জ্বলা সরকারি অ্যাভেনিউর পথে গেলে বেণীমাধবের বাড়ি আমার এখান থেকে মাইলখানেক। মাঠের মধ্য দিয়ে গেলে অনেকটা কাছে হয়, কিন্তু সেখানে খানাখন্দ আছে, মাঝে-মাঝে সাপও বেরোয় বর্ষাকালে। কিন্তু সে-সব ভাবার আমার সময় ছিলো না তখন। জরুরি হচ্ছে বেণীমাধবকে এই খবরটা জানানো যে ছেলেরা তাঁর বিরুদ্ধে খেপে গেছে, তিনি যেন সাবধানে থাকেন, কিংবা—তা-ই ভালো হয়—দু-একদিনের মধ্যেই চ'লে যান কলকাতায়। এই কাজটি নিজের ঘাড়ে না-নিয়ে পারলাম না আমি, কেননা বেণীমাধব যেমনই লোক হোন, যা-ই ক'রে থাকুন, এই বিদ্যাপীঠে আবার একটা মার-পিঠের কেলেঙ্কারি না হোক, এইটে ইচ্ছে না-করা অসম্ভব ছিলো আমার পক্ষে। তাছাড়া বেণীমাধব কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র; নবেন্দু গুপ্তর ঘটনাটা যদি বা তাঁরা উপেক্ষা ক'রে যান, বেণীমাধবের গায়ে কোনো ছেলে হাত তুললে সে ক্ষমা পাবে না, কঠিন শাস্তি পাবে। গোঁয়ার শঙ্কর সিং যেন অনর্থক নিজের ক্ষতি না করে, সে-কথা ভেবেও আমার চলা দ্রুত হ'য়ে উঠলো।

মাঠের পথ ধরলাম। ঝেঁকে-ঝেঁকে পাৎলা বৃষ্টি হচ্ছে; সূক্ষ্ম ফোঁটাগুলো হাওয়ার বেগে তাড়িত হ'য়ে ছুঁচের মতো বিঁধছে আমার ঘাড়ে গলায়, ভেজা ঘাসে শপশপ করছে পায়ের জুতো, মাঠে ঘন হ'য়ে জ'মে আছে অন্ধকার। কিন্তু এই অসুবিধেগুলোকে লক্ষ করার মতো মনের অবস্থা আমার ছিলো না তখন, বরং—একটানা প্রায়

পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে নানা লোকের নানা রকম কথা শোনার পর—এই বৃষ্টি আর অন্ধকার আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেণীমাধবের পাড়ায় এসে পৌঁছলাম। আবছা শাদাটে দেখা যাচ্ছে বাড়িগুলোর আকৃতি, শেষ বাড়িটি বেণীমাধবের, তারপর আবার একটা ফাঁকা মাঠ। আমি কাছাকাছি আসতেই একটা লোক হুংকার দিয়ে আমার উপর পড়লো। এক লাফে স'রে গিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে ?'

'ক্ষমা করবেন, স্যর। আপনি এখানে যে ?'

'শঙ্কর সিং !'

'ইয়েস, স্যর,' ইংরেজিতে জবাব দিলো শঙ্কর সিং। 'আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, স্যর, অনুনয় করছি—আপনি এই ঘটনা-স্থল থেকে স'রে যান।'

অন্ধকারেও দেখতে পেলাম, শঙ্কর সিং-এর মুখ শাদা, ঠোঁট কাঁপছে। আর তার হাতে একটা বেঁটে বয়-স্কাউটের লাঠি। তাহ'লে ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। ভাগ্যিশ !

আমি জিগেস করলাম, 'অন্য দু-জন কোথায় ?'

'তাদের সুমতি হয়েছে, "এ-সব হাঙ্গামার মধ্যে" আর থাকতে চায় না তারা। দরকার হ'লে দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইবে। ক্ষমা চাইতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার আগে—' হঠাৎ থেমে শঙ্কর সিং বললো, 'আপনি ফিরে যান, স্যর।'

আমি ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলাম, 'ফিরে আমি যাবো না, শঙ্কর। চলো, তুমি আর আমি একই সঙ্গে বেণীমাধববাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।'

'তাঁর সঙ্গে আমার দেখা এই মাঠেই ভালো জমবে। এক ঘণ্টা হ'য়ে গেলো অপেক্ষা করছি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।'

'এক ঘণ্টা ধ'রে অপেক্ষা করছো ?'

'তার আগে সারা ক্যাম্পাস ভ'রে খুঁজেছি। আর এখানে এসে দাঁড়ানো মাত্র বৃষ্টি শুরু হ'লো। ভালো বৃষ্টি। চমৎকার রাতটি হয়েছে, না স্যর? এই বৃষ্টিতে আর অন্ধকারে সহজে কেউ বেরোবে না। নিরিবিলিতে দেনা-পাওনা মিটিয়ে নিতে পারবো ওঁর সঙ্গে। স্যর, অন্য একটি রাতের কথা মনে পড়ছে আমার, সেই যখন প্রোফেসর গুপ্তকে ধুলো খাইয়ে ছেড়েছিলাম। একটা কথা তিনি বলেননি, একবার আওয়াজ বের করেননি গলা দিয়ে। কিন্তু নাতালীদি—তাঁর চীৎকার আপনি শুনেছিলেন, স্যর? শুনেছিলেন? সেই আওয়াজটাকে চাটনির মতো চেখে-চেখে বেণীমাধব তখন গরম ভাত খাচ্ছিলেন মুর্গির ঝোল দিয়ে। তা জানেন, স্যর?

আমি শঙ্কর সিং-এর পিঠে হাত রাখলাম। তার জামা ভিজে লেপটে গেছে, সে যে ভিতরে-ভিতরে কাঁপছে আমি তা হাতেই টের পেলাম। বললাম, 'বেণীমাধববাবু হয়তো ভিতরেই আছেন। চলো, দেখি গিয়ে। আর তোমার হাতের ঐ লাঠিটা আমাকে দিয়ে দাও।'

লাঠি-ধরা হাতটা পিছনে লুকিয়ে সে বললে, 'না। কেউ নেই ভিতরে। ঘর অন্ধকার।'

'হয়তো আজ সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'তা যদি হয় তো ভালোই। আর-একটু রাত হোক, আমি জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে এমন ব্যবস্থা করবো যাতে কয়েক মাস বিছানাতেই বিশ্রাম করতে পারেন। কিন্তু আজই—আজ রাত্রেই করা চাই। কাল হয়তো আর সুযোগ পাবো না। হয়তো রাগও প'ড়ে যাবে আমার। হয়তো দেখা হ'লে আবার হেসে কথা বলবো। স্যর, কোনটা ভালো? হিপক্রিসি, না খোলাখুলি শত্রুতা?'

'কোনোটাই ভালো না।'

'কিন্তু কোনটা বেশি খারাপ? যখন কাউকে ঘৃণা করি তার

বিষয়ে কী আমাদের কর্তব্য ? সামনে মিষ্টি হেসে পিছন থেকে তাকে ছুরি মারা, না কি মুখোমুখি তার মাথা ফাটানো ?'

আমি বলতে চাইলাম, 'আমাদের উচিত তাকে ভালোবাসতে চেষ্টা করা,' কিন্তু কথাটা আমার গলায় বেধে গেলো। শঙ্কর সিং আবার বললে, 'আপনার কি মনে হয় না, স্যর, যে যুদ্ধ একটা চমৎকার ব্যাপার ? বহুদিন যুদ্ধ করি না ব'লেই আমরা ভারতীয়রা এত নেমে গেছি জগতে ?'

আমি তার হাত চেপে ধ'রে বললাম, 'শঙ্কর সিং, চলো, তোমাকে হস্টেলে পৌঁছিয়ে দিই।'

'ছাড়ুন আমাকে, আমার সঙ্গে গায়ের জোরে আপনি পারবেন না। মাপ করবেন, স্যর, আমি আপনার ছাত্র, আপনার কথা অমান্য করা আমার উচিত না, কিন্তু এমন কোনো-কোনো সময় তো আছে যখন আমরা সকলেই মানুষ হ'য়ে পাশাপাশি দাঁড়াই। পাশাপাশি— বা মুখোমুখি।—শ্ শ্—ঐ যে!' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শঙ্কর সিং কয়েক পা পিছনে স'রে গেলো।

অন্ধকারে ছায়ার মতো একটি লোককে আসতে দেখা গেলো আমাদের দিকে। তার মাথার উপরে ছাতার জন্য তার মুখ দেখতে পেলাম না, কিন্তু এটুকু বুঝলাম সে বেণীমাধব নয়। পাছে শঙ্কর সিং আন্দাজেই কিছু ক'রে বসে, সেই ভয়ে হাঁক দিলাম, 'কে ?'

'আজ্ঞে আমি। মদন। বেণীমাধববাবুর বাসায় নকরি করি।'

'ও। তা, মদন, আমরা তোমার বাবুর কাছেই এসেছিলাম।'

'বাবুর কাছে ?' মদন আমাকে চিনতে পেরে বললে, 'আসুন, ঘোরে এসে বসুন। বাইরে দাঁড়িয়ে ভেজেন কেন ?'

'তোমার বাবু কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?'

'তা হোবে। এতক্ষণে কি আর জেগে আছেন ট্রেনে।'

'ট্রেনে? বলছো কী তুমি?'

'আজ শামকো ট্রেনে কলকত্তা গেছেন বেণীবাবু।

'আজ শামকো ট্রেনে?' চেঁচিয়ে উঠলো শঙ্কর সিং। 'ঠিক বাৎ?'

'হাঁ জী, ঠিক। আইয়ে জী, বৈঠিয়ে জেরা।'

আমি দ্রুত একটা হিশেব ক'রে ফেললুম মনে-মনে। এর মানে—আমার সঙ্গে যখন দেখা হ'লো, ঠিক তার পরেই ট্রেন ধরেছেন বেণীমাধব, হয়তো টিকিটটা তখন পকেটেই ছিলো—হয়তো মালপত্র আগে পাঠিয়ে দিয়ে সোজা রিক্‌শ নিয়ে পৌঁচেছেন স্টেশনে। বিরাট স্বস্তি অনুভব করলাম মনের মধ্যে, আবার কোথায় যেন একটু নিরাশও হলাম।

'কব্‌ আয়েগা ফিন?' শঙ্কর সিং জিগেস করলো।

উত্তরে মদন জানালে যে বাবু কবে ফিরবেন তার ঠিক মালুম নেই। আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সে তার ভাইয়ের কাছে সীতারামপুরে যাবে, বাবুর চিঠি পেলে আবার আসবে। তাঁর আসতে কিছু দেরি হ'তে পারে ব'লে গেছেন।

'আচ্ছা, মদন, ঘরে যাও। আমরাও ফিরি।'

'নোমোস্কার, বাবু।'

আমি শঙ্করের দিকে ফিরে বললাম, 'বেণীমাধববাবু আর ফিরবেন না এখানে। চলো।'

হাপরের মতো একটা নিশ্বাস ছেড়ে শঙ্কর সিং বললে, 'পালালো লোকটা!' তার অসাড় হাত থেকে লাঠিটা খ'সে পড়লো।

এর পরে আর কথা বললো না; সুশীলভাবে আমার পাশে-পাশে হাঁটতে লাগলো। ফিরতে অনেক বেশি সময় লাগলো, অনেকবার হোঁচট খেলাম, শঙ্কর একবার পা পিছলে প্রায় প'ড়ে গেলো।

মনে হ'লো পথে একবার লোকেনবাবুকে দেখে যাই; এনকোয়ারির গুজব শুনেই বেণীমাধব কেটে পড়েছেন এই খবরটা দিয়ে যাই তাঁকে।

কিন্তু তাঁর বড়ো ছেলে বেরিয়ে এসে বললো, 'বাবার ভীষণ হাঁপানির টান উঠেছে, কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।'

শঙ্করের সঙ্গে তার হস্টেলের গেট পর্যন্ত গেলাম। সে এতক্ষণ একটিও কথা বলেনি, কিন্তু ভিতরে যাবার আগে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যর, কী ক'রে জানলেন বেণীমাধববাবু আর ফিরবেন না?'

'তিনি কলকাতায় চাকরি নিয়েছেন। সেখানেই থাকবেন।'

'আমিও যাবো কলকাতায়! খুঁজে বের করবো তোমাকে! আমার হাত তুমি এড়াতে পারবে না! You bloody s'b'tch!'

একটা কুৎসিত ইংরেজি গালি চীৎকার ক'রে শঙ্কর সিং দৌড়ে ভিতরে চ'লে গেলো। আমি বাড়ি ফিরে তক্ষুনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দ্বিতীয় খণ্ড

গল্প লেখার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে আমি এই কাহিনীর শেষটা আগেই ব'লে দিয়েছি; এখন পাঠককে গোড়ার দিকটা জানানো দরকার।

এ পর্যন্ত প'ড়ে পাঠকের যদি ধারণা হ'য়ে থাকে যে বিদ্যাপীঠে কিছু ভালো নেই, রমণীয় নেই, তার চেয়ে দুঃখের কথা আর-কিছু হ'তে পারে না, আমার এই অক্ষম লেখনীকেই দায়ী করতে হবে সেজন্য। আগন্তুকের পক্ষে, নবাগতের পক্ষেও, বিদ্যাপীঠ মনোমুগ্ধকর। আমিও প্রথম এসে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

এই আমার প্রথম চাকরি। একই সময়ে কলকাতার গুরুদাস কলেজেও পেয়েছিলাম, কিন্তু সেখানকার দু-শো ছাত্রওলা এক-একটি ক্লাশের আয়তনে ভয় পেয়ে মুক্তিগ্রামের ইস্কুলেই চ'লে এলাম। এসে অনুতাপ করতে হয়নি; ভালো লেগেছিলো।

বাংলাদেশের একজন আধুনিক লেখিকা তাঁর এক গল্পের নায়ককে দিয়ে বলিয়েছেন, 'আমি একজন অতিশয় সাধারণ যুবক।' ঐ বর্ণনাটি আমার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে আমি স্কুল থেকে আরম্ভ ক'রে সবগুলো পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পাশ ক'রে গেছি এবং ভালোই পাশ করেছি—তিমিরমগ্ন পরীক্ষক মহাশয়কে আমার উজ্জ্বল মেধার প্রতি অবিচার করার কোনো সুযোগ দিইনি। কলেজে ডীবেট করেছি, বন্ধুবান্ধবও ছিলো, কিন্তু মহানগরীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস ক'রেও সহপাঠিনীর সঙ্গে 'প্রেম' করিনি, বা পলিটিক্সও করিনি। এমনি অপদার্থ আমি। 'প্রেম' বিষয়ে আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে প্রতিযোগিতায় পারবো না, অত হাঁটাহাঁটি খাটাখাটনি সাধ্যে কুলোবে না আমার, তার চেয়ে বরং অনতিদূর থেকে অন্যদের

লীলাখেলা দেখাটা কৌতুকজনক। আর পলিটিক্সে আমার অবাক লাগতো ছাত্র-পাণ্ডাদের জবরদস্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে—কত সহজে তারা বাকুনিনকে কাবাব বানিয়ে ছাড়ে, কত সহজে ট্রটস্কিকে বলে 'রেনিগেড' আর মাও-ৎসে-তুংকে এশিয়ার ত্রাণকর্তা, কেমন সাবলীলভাবে ঘোষণা করে যে ভারতের প্রথম 'প্রগতিশীল' আন্দোলনের নাম সিপাহী বিদ্রোহ, আর মধ্যযুগটাকে এতদিন আমরা শোচনীয়রকম ভুল বুঝেছি। যদি জিগেস করা যেতো, 'কেন? ভুল বুঝেছি কেন? মধ্যযুগে কি ডাইনি পোড়ানো হ'তো না? বিজ্ঞানকে বেঁধে রাখা হয়নি কি? কোনো ব্যক্তি বা সম্প্রদায় স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিলে সহ্য করা হ'তো কি তাকে? এমন কোনো নতুন তথ্য কি জানা গেছে যার ফলে আমাদের এই ধারণাগুলি বদলাতে পারে?'—তার উত্তরে শুধু শুনতাম, 'মধ্যযুগেই রেনেসাঁসের বীজ লুকিয়ে ছিলো—' (যে-কথাটা এত স্বতঃসিদ্ধ যে বলার কোনো দরকার করে না)—'আর ব্যক্তিকে এত বেশি স্বাধীনতা দিয়েও রেনেসাঁস ভালো করেনি।' অর্থাৎ, এই পাণ্ডাদের ছিলো সুদৃঢ় কতগুলো মত—কতগুলো মত মাত্র, যাতে বিশ্বাস জোরালো থাকলে যাচাই ক'রে দেখার দরকার হয় না; আর আমার ছিলো (এখনো আছে) এক হাস্যকর জ্ঞানতৃষ্ণা, যে-কোনো প্রশ্নকে নানা দিক থেকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে চাইতাম। আর নানা দিক থেকে দেখতে চাইলে, বলা বাহুল্য, পলিটিক্স করা অসম্ভব।

বন্ধুদের মুখে তখন শুনেছি যে ইতিহাসের একটা নিজস্ব অভিপ্রায় আছে, যুগ-যুগ ধ'রে তারই বিকাশ ঘটছে মানবসমাজে; এক স্থির লক্ষ্যের দিক 'অমোঘভাবে' এগিয়ে চলেছি আমরা। প্রাচীন কাল ও মধ্যযুগ, বৌদ্ধধর্ম ও খৃষ্টধর্ম, রেনেসাঁস ও মার্টিন লুথার, যন্ত্রবিপ্লব ও ফরাশি বিপ্লব—সবই নাকি সেই ক্রমাভিব্যক্তিরই বিভিন্ন ধাপ, একটার সঙ্গে অন্যটা শৃঙ্খলের মতো যুক্ত হ'য়ে আছে এবং সেই

পারম্পর্যের পর্যালোচনা করলেই পরবর্তী ধাপটি বিষয়েও নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। আমি মানি, এই মতটি হৃদয়গ্রাহী, এতে বিশ্বাস করলে দায়িত্ব লঘু হয়, জীবনে শান্তি আসে; আর যে-ভাবে, 'যুগ' হিশেবে ভাগ ক'রে-ক'রে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকাদি লেখা হ'য়ে থাকে, তাতে এর সপক্ষে যুক্তি বের করাও শক্ত হয় না। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র হ'য়েও—বা সেইজন্যেই—আমি কখনো ভেবে পাইনি ইতিহাসের কেমন ক'রে কোনো 'অভিপ্রায়' থাকতে পারে—ইতিহাস কি এক চৈতন্যময় পুরুষ? যে-সিংহাসনে ভগবান টিকে থাকতে পারলেন না তাতে ইতিহাস নামক ধারণাটিকে অভিষিক্ত করলে মানবজাতি এক নতুন ও নিকৃষ্ট নিয়তিবাদের অধীন হ'য়ে পড়বে, তার দাসোচিত কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও বিচারবুদ্ধি যাবে নষ্ট হ'য়ে—এই রকম মনে হয়েছে আমার, মাঝে-মাঝে মুখেও ও-কথা বলিনি তা নয়। আর তাই, পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকলেও সহপাঠীদের প্রিয়পাত্র আমি হ'তে পারিনি—ক্ষমাশীল পাঠক আমাকে সেই অযোগ্যদের অন্যতম ব'লে ধ'রে নিতে পারেন, যারা গুরুজনের অনুগ্রহ পেলেও সমবয়সীর মনঃপূত হয় না। হয়তো সেটাও একটা কারণ, যে-জন্যে কলকাতার সংসর্গ ছেড়ে এই মুক্তিগ্রামের মফস্বল আমি পছন্দ করেছিলুম।

আমার ভালো লেগেছিলো এখানকার শৃঙ্খলা, এখানকার প্রথাবদ্ধ, মসৃণ ও অনুত্তেজিত জীবন। মীটিং নেই, চ্যাঁচামেচি নেই, ছাত্রেরা কথায়-কথায় স্ট্রাইক করে না, আর শিক্ষকেরা ছাত্রদের মুখ চেনেন, নাম জানেন, খুঁটিনাটি খবর রাখেন তাদের বিষয়ে। স্কুলের ঘণ্টা শেষ হ'লেও স্কুলের জীবন ফুরোয় না; ছাত্র ও শিক্ষকদের অবকাশটুকুও এই বিদ্যালয়কে অবলম্বন ক'রেই সফল হ'য়ে ওঠে। খেলা, ডীবেট, প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা, আবৃত্তি, অভিনয়, প্রীতিসম্মেলন—এমন কোনো সপ্তাহ যায় না যাতে কিছু-না-কিছু ব্যাপার না থাকে,

এমন কোনো মাস যায় না যখন সেক্রেটারি ও প্রিন্সিপাল থেকে আরম্ভ করে আমার মতো কনিষ্ঠ শিক্ষক পর্যন্ত সামাজিকভাবে একত্র হবার সুযোগ না পান। এই সব-কিছুই ভালো লেগেছিলো আমার ; রোজ একই সময়ে একই নির্দিষ্ট কাজ করতে হবে—এই ব্যবস্থায় আমি আরাম পেয়েছিলাম। বলা যেতে পারে সওদাগরি কেরানিগিরিতেও এই আরামের অভাব নেই ; কিন্তু এখানকার কাজের উপাদান কতগুলো ময়লা রঙের লাল-ফিতে-বাঁধা ফাইল নয়, একদল জীবন্ত ও বাড়ন্ত মানুষ, যাদের চোখে-মুখে, কথাবার্তায় ও ব্যবহারে নিজের কাজের ফলাফল প্রতিদিন দেখতে পাওয়া যায়, কখনো-কখনো যারা একটিমাত্র মেধাবী দৃষ্টিতেই পরিশ্রমীকে পুরস্কৃত করতে পারে। তাদের তরুণ বুদ্ধিকে সতেজ ক'রে তোলা, জ্ঞানের লিপ্সাকে যথোচিত খাদ্য জোগানো, নানা বিষয়ের মধ্য দিয়ে চালিয়ে-চালিয়ে নিজেকে আবিষ্কার করতে শেখানো—এই কাজে আনন্দ আছে সন্দেহ কী—অন্তত আমার প্রথম এসে মনে হয়েছে যে রাজধানীর বড়ো কলেজে তোতাপাখি-পড়ানোর চাইতে এটা শতগুণে, হাজারগুণে ভালো।

জানি, অভিজ্ঞ পাঠকের কানে অত্যন্ত ছেলেমানুষি শোনাবে এই কথাগুলো ; জানি, আমার মতো আরো অনেক বাঙালি যুবক অতি উৎসাহে শিক্ষকতার বৃত্তি নিয়ে, তারপর কয়েক বছরের মধ্যে ছিবড়েতে পরিণত হ'য়ে গেছেন। আমার ভবিষ্যৎ যে তাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল হবে এমন কোনো উচ্চাশা আমি রাখি না। কিন্তু এখানে আরেকটা কারণ উল্লেখ করা দরকার, যেজন্যে বিদ্যাপীঠে এসে আমার ভালো লেগেছিলো। আমি এসে চিন্তামণি দত্তকে প্রিন্সিপাল পেয়েছিলুম।

আমি ধ'রে নিচ্ছি যে শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এমন কেউ নেই, যিনি চিন্তামণি দত্তের নাম না শুনেছেন। রোজ সকালে দু-খানা ক'রে দৈনিক আর শনিবারে একটি সাপ্তাহিক পড়লেই তাঁর

অস্তিত্ব জানা যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু কোনো জ্ঞানের বিষয়ে যাঁদের অল্পবিস্তর কৌতূহল আছে তাঁরা তাঁর বিশ্বম্ভর মনের কিছু-না-কিছু পরিচয় পাননি এটা অসম্ভব মনে হয়। বাংলার উনিশ শতক থেকে ছিটকে-পড়া মানুষ যেন তিনি, জ্ঞানের চর্চা করেন তাকে মনুষ্যত্বেরই নামান্তর ব'লে জানেন ব'লে, আর জ্ঞানের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন বিভাগের অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। কুড়ি বছর আগে তিনি এম. এ. দিয়েছিলেন ফিলজফিতে, কিন্তু ইতিমধ্যে এমন কোনো বিষয় নেই যা তিনি পড়েননি—রাষ্ট্রনীতি থেকে গণিত, সাহিত্য থেকে নৃতত্ত্ব পর্যন্ত কিছু বাদ দেননি—আর পড়েছেন শুধু কৌতূহল মেটাবার জন্য নয়, 'সব শাস্ত্র পরস্পর-সম্পৃক্ত ব'লে, একটাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে অন্যটা না-জানলে চলে না ব'লে।' 'কবিতা বুঝতে হ'লে ইতিহাস জানতে হয়, ইতিহাস বুঝতে হ'লে দর্শন, দর্শন বুঝতে হ'লে রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রনীতি বুঝতে হ'লে নীতি, নীতি বুঝতে হ'লে ধর্ম, ধর্ম বুঝতে হ'লে নৃতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বুঝতে হ'লে মনস্তত্ত্ব, আর মনস্তত্ত্ব বুঝতে হ'লে কবিতা—অতএব কেউ যেন কোনো-কিছু বোঝার চেষ্টা না করে—' তাঁকে যারা পছন্দ করে না তারা এই রকম একটা পরিহাস উদ্ভাবন করেছিলো তাঁকে লক্ষ্য ক'রে। 'তিনি সবই চেখে ছাখেন, কোনোটাই আহার করেন না;' 'এই বিশেষীকরণের যুগে যে-কোনো একটি বিষয়ের একটিমাত্র অংশের চর্চার পক্ষেও সারা জীবন যথেষ্ট নয়;—' এই সব মন্তব্যও তাঁর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে মাঝে-মাঝে, আর এ-কথাও হয়তো উড়িয়ে দেয়া যায় না যে এতগুলো বিষয়ে মনোনিবেশ করার জন্যেই তাঁর সৃষ্টিশীলতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে; তাঁর জ্ঞানের পার্লামেণ্টে —যাদের উচিত ছিলো পরস্পরের পরিপূরক হওয়া, তারা কার্যত পরস্পরের প্রতিবাদ ক'রে কাউকেই বেশি কথা বলতে দেয়নি। তবু, দেশের মধ্যে প্রায় অমানুষিক পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিলো তাঁর, আর বাংলায় ও ইংরেজিতে লেখা তাঁর পুস্তক বা পুস্তিকাগুলি, আকারে

ক্ষীণ ও সংখ্যায় স্বল্প হ'লেও, বোদ্ধার কাছে তাঁর খ্যাতিকে আরো দৃঢ় ক'রে তুলেছে—শুধু পণ্ডিত ব'লেই খ্যাতি নয়, একজন দ্রষ্টা ব'লেও।

চিন্তামণি দত্তের পরনে থাকে কোকিল-পাড় কুঁচোনো তাঁতের ধুতি, গায়ে ফিনফিনে আদ্দির জামা, পায়ে তালতলার চটিজোড়াটি লাল রঙের। মাইকেলি ধরনের মাঝখান-দিয়ে-সিঁথি-করা কোঁকড়া তাঁর চুল, চোখ দুটি টানা-টানা, কাছে দাঁড়ালে ও-ডি-কলোনের সূক্ষ্ম সুগন্ধ পাওয়া যায়। দেখলে তাঁকে পণ্ডিত ব'লে মনে হয় না; মনে হয় কলকাতার 'বড়ো ঘরের ছেলে'—আর সেই বর্ণনাটি মিথ্যেও নয় তাঁর বিষয়ে। পৈতৃক বিত্তে মধ্যবয়স পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে চ'লে গেছে তাঁর; তবে তাঁর বাগবাজারের বাড়িটি, আয়তনে প্রকাণ্ড হ'লেও, সম্প্রতি রীতিমতো জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে। এদিকে তাঁর ছেলেপুলেও বিস্তর, অনেকেই তারা ছোটো আছে এখনো, স্ত্রী প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, বিনা উপার্জনে আর কুলোতে চায় না। তাই, চল্লিশ পার হ'য়ে জীবনে এই প্রথম বার চিন্তামণি দত্তকে চাকরি নিতে হ'লো।

শুনেছি, যমুনাদাসের নির্বন্ধাতিশয্যেই এই যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিলো। মহাভারত বিষয়ে শো-দেড়েক পৃষ্ঠার একখানা বই আছে চিন্তামণি দত্তর—তাঁর প্রথম যৌবনের লেখা—সেটি দৈবাৎ প'ড়ে ফেলে লীলারামজী নাকি এতদূর অভিভূত হন যে খোঁজ-খবর করিয়ে নিজে কলকাতায় গিয়ে তাঁকে আসতে রাজি করান মুক্তিগ্রামে। তিনি রাজি হওয়াতে তাঁর বন্ধুরা খুব অবাক হয়েছিলো। যে-চিন্তামণি দত্ত কখনো ডক্টরেট ডিগ্রি নেননি—কেননা তাঁর 'ওয়েইস্ট পেপার-বাস্কেট থেকে কাগজ কুড়িয়ে' অন্যেরা ডক্টরেট পেয়েছে—চার বার য়োরোপে গিয়েও কোনো ডিগ্রি না-নিয়ে ফিরে এসেছেন, অধ্যাপনার পদ পেয়েও দৃক্‌পাত করেননি তার

দিকে—তিনি কিনা হঠাৎ একটা ইস্কুলের হেডমাস্টারিতে রাজি হলেন !

এর উত্তরে তিনি বলেছেন,—'কী করবো, টাকার দরকার, আর এর চেয়ে বেশি টাকা কে আর দেবে আমাকে।'

আর এমনি ক'রেই চিন্তামণি দত্তের সংসর্গ লাভ করার মতো সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। সন্ধেবেলা বা রোববার সকালে আমরা কয়েকজন গিয়েছি তাঁর বাড়িতে ; লোকেনবাবু, অভিজিৎ, আর আমি, আরো কেউ-কেউ—গিয়ে দেখেছি, প্রবীণেরা ঘিরে ব'সে আছেন তাঁকে, আমরা এমন কোনো-একটা সময়ে যেতে পারিনি যখন আরো অন্তত তিন-চারজন সেখানে উপস্থিত না-থেকেছেন, কখনো-কখনো সেক্রেটারি সুদ্ধ। তাঁর জীবনযাপনে আব্রু ছিলো কম, সঙ্গে স্ত্রী না-থাকার জন্য আরো বেশি প্রকাশ্য হ'য়ে পড়েছিলেন ; প্রথম-প্রথম আমার অবাকই লাগতো যে প্রায় সব সময় একটা মীটিঙের মধ্যে ব'সে থাকতে তাঁর মতো জ্ঞানীজনের কী ক'রে ভালো লাগতে পারে। দু-চার দিন পরেই অবশ্য বুঝেছিলাম যে আশে-পাশে যত লোকই থাক, আসলে তিনি একাই থাকেন, কাউকে যেন ভালো ক'রে লক্ষ করেন না, সোজাসুজি বিশেষ একজনকে লক্ষ ক'রেও বলেন না কিছু ; তাঁর কথা অবিরল নয়, যেটুকু বলেন ধীরে বলেন, যেন দ্বিধান্বিতভাবে, বা আপন মনে, কারো কাছে কোনো মন্তব্য আশা করেন না, হঠাৎ অন্যের কোনো কথা কানে এলে প্রায় অবাক হ'য়ে তাকান তার দিকে। আর এরই ফাঁকে-ফাঁকে কিছু-কিছু মণিমুক্তো কুড়িয়ে নিতে পেরেছি আমি, অনুভব করেছি তাঁর মনের বিস্তার ও চিন্তার গভীরতা, এক-এক সময়ে রোমাঞ্চিত হয়েছি ছোট্ট এক-একটি কথা শুনে। তাঁর সামনে উচ্চ-নীচের প্রভেদ মুছে গেছে ; তাঁর অপেক্ষাকৃত তারুণ্য সত্ত্বেও, সকলেই যেন ছাত্র হ'য়ে গেছে তাঁর কাছে ;—আর এমনি ক'রে এক ঘণ্টা বা দু-ঘণ্টা কাটাবার পরে তিনি হঠাৎ মৃদুস্বরে একটি 'আচ্ছা'

উচ্চারণ করতেন, সঙ্গে-সঙ্গে সকলেই উঠে আস্তে-আস্তে বিদায় নিতো। আর তাঁর ঘর থেকে বেরোনোমাত্র স্পষ্ট হ'য়ে উঠতো পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ।

এ-সব গুণ কোনো কর্মস্থলে জনপ্রিয়তার সহায়ক নয়; কিন্তু সেই প্রথম কয়েক মাস বিদ্যাপীঠের সাধারণ আবহাওয়া ছিলো তাঁর প্রতি বিশেষ অনুকূল; 'আমাদের কত ভাগ্যে চিন্তামণি দত্তকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি,' এ-রকম কথা অনেকের মুখেই শোনা গেছে। তাঁর বিদ্যাবত্তা ঠিক কোন বিষয়ে বা কী ধরনের সে-বিষয়ে অনেকেরই ধারণা খুব অস্পষ্ট, তবু, 'ব্রজেন শীলের পরে এত বড়ো মাথাওলা লোক আর এ-দেশে জন্মায়নি'—এই কথাটা দেখতে-দেখতে বিদ্যাপীঠের একটা বুলি হ'য়ে দাঁড়ালো। অবশ্য তাঁর চরিত্রের দুর্বল দিকগুলিও নির্ভুল জনমতের কাছে অনাবিষ্কৃত রইলো না বেশি দিন; শিগগিরই আমাদের শুনতে হ'লো যে 'তিনি মস্ত বড়ো পণ্ডিত হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাবিলিটি নেই'; 'আপিশে কমই যান, বাড়ি ব'সেই কাগজপত্র সই করেন—কিসে সই করছেন তা বোধহয় প'ড়েও ছাখেন না'; 'বড়ো নরম মানুষ, কেউ গিয়ে কেঁদে পড়লেই তার চাকরির বা প্রোমোশনের জন্য চেষ্টা করেন'; 'লোক চেনেন না, ট্যাক্ট নেই'; 'ও-সব কোঁচানো ধুতি আর চটি প'রে কি আর কোনো কাজ হয় এ-যুগে!'—আর শেষ পর্যন্ত কথাটা এখানে পৌঁছলো যে চিন্তামণি দত্ত বিদ্যাপীঠের প্রিন্সিপাল হবার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নন। এখন ভাবতে অবাক লাগে এই মতটা কত সহজে ছড়িয়ে পড়লো আমাদের মধ্যে: 'কোনো অভিজ্ঞতা নেই, প্রথম চাকরিতেই এত বড়ো একটা দায়িত্ব সামলাবেন কী ক'রে?'; 'নিজের বাড়ির নিরাপদ লাইব্রেরিতে জীবন কাটিয়ে অকেজো হ'য়ে গেছেন'; 'আসলে উনি ডিলেটাণ্টে, কখনোই কোনো কড়া ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়ে যাননি—বই-টই লিখুন ভালো কথা, বাট টীচিং ইজ অ্যানদার ম্যাটার'; 'চার-

বার কেন, দশবার য়োরোপে যাবারই বা মূল্য কী, যদি শুধু বেড়াতে যাওয়া হয় ?'—এই ধরনের উক্তিগুলো এক-এক চামচে চাটনির মতো এক জিভ থেকে আরেক জিভে শান দিয়ে-দিয়ে ফিরতে লাগলো ; পরস্পরের ঠোঁট চাটার শব্দে কারোরই আর চক্ষুলজ্জাটুকুও রইলো না। অবশ্য এই পরিবর্তন ঘটলো বিশেষ একটা কারণে বা উপলক্ষে, আর সেই উপলক্ষের নামই নবেন্দু গুপ্ত।

॥ দুই ॥

প্রোফেসর গুপ্তর নিয়োগের সময় মুক্তিগ্রামে কারো জানতে বাকি ছিলো না যে তিনি প্রিন্সিপালের বন্ধু, এবং প্রিন্সিপাল-সাহেব প্রথম সুযোগেই একটি বন্ধুকৃত্য সম্পাদন করেছেন। অবশ্য এ-দু'জনের মধ্যে বয়সের তফাৎ কুড়ি বছরের; নবেন্দু যখন বিলেতে পাড়ি দিলেন, চিন্তামণি তখন হামাগুড়ি দিচ্ছেন মেঝেতে; একজন বসবাস করেছেন য়োরোপে, আরেকজন ভারতে; এ-অবস্থায় দু-জনের মধ্যে কী-ধরনের বন্ধুতা সম্ভব তা নিয়ে এখন আর আলোচনা ক'রে লাভ নেই। প্রোফেসর গুপ্তর মুখেই শুনেছি যে চিন্তামণিবাবুর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয় মাত্র বছর পাঁচেক আগে লণ্ডনে, তারপর (দু-বছর আগে) জেনেভায় একই বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা মাসখানেক—তখন কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয় তাঁদের মধ্যে, যার ফলে তাঁর মনের একটি গোপন ইচ্ছা তিনি চিন্তামণিবাবুর কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলেন। সে-ইচ্ছেটি দেশে ফেরার জন্য।

কী কারণে নবেন্দু গুপ্ত তরুণ বয়সেই দেশত্যাগী হয়েছিলেন তা আমি সঠিকভাবে জানি না। কেউ বলেন, পুলিশের সন্দেহ এড়াতে; অন্যেরা বলেন, হৃদয়ঘটিত কারণে। হয়তো বা দ্বিতীয়টাই সত্য। কেননা হিশেব করলে দেখা যাবে যে তিনি দেশ থেকে বেরোন প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার বছরখানেক আগে, যখন বাংলার বোমারুদের আর পাত্তা নেই, অসহযোগ আরম্ভ হ'তেও দেরি আছে। বরং তিনি একটি বসুবংশীয় কন্যাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে পিতার রোষানল প্রজ্বলিত করেছিলেন, যার ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে বিলেতে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো—এই থিওরিটায় অবিশ্বাস করার কারণ দেখি না। বাপের উপর, এবং এই মূর্খ সমাজের উপর, প্রতিশোধ নেবার জন্যই

তিনি আর ফিরলেন না তাঁর জন্মভূমিতে, মা-র কাতর অনুনয় সত্ত্বেও না, বাপের মৃত্যুকালেও না মায়ের 'শেষ ইচ্ছা' রাখার জন্যেও না—তারপর এমন একটা অবস্থা হ'লো যখন প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনাই লুপ্ত হ'য়ে গেলো।

নিজেকে নির্বাসিত ক'রে, বলা বাহুল্য, নবেন্দু 'মূর্খদের' উপর কোনো প্রতিশোধ নিতে পারেননি, শুধু পিতামাতার মনে কষ্ট দিয়েছিলেন, আর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিলেন নিজের। সুপুত্র হ'লে যে-সম্পত্তি তাঁর প্রাপ্য হ'তো (প্রায় এক লাখ টাকার ব্যাপার), তা যখন জ্ঞাতিরা দখল ক'রে নিলে, তখন তিনি নানা দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্লিনে, ম্যুনিখ প্যাক্ট সই হবার পরে পৃথিবীর আসন্ন সর্বনাশ নিয়ে এতই উত্তেজিত হ'য়ে আছেন যে এক লক্ষ টাকা মূল্যের তুচ্ছ পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ে চিন্তা করার সময় নেই। শোনা যায়, বিধবা মা তাঁকে ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা হিশেবে নিজের ছোটো ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন য়োরোপে, কিন্তু সে-ভদ্রলোক কোথাও তাঁকে খুঁজে পাননি, কিংবা তাঁর এতটা উদ্যম ছিলো না যে নানা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে-দিয়ে ফেরারি ভাগনেকে গ্রেপ্তার করেন। তাছাড়া, প্যারিসের এক বিখ্যাত নাইট-ক্লাবে একরাত্রে একশো পাউণ্ড খরচ ক'রে প্রৌঢ় বাঙালি গৃহস্থটি বিবেকে ও মূলধনে এতটা দুর্বল হ'য়ে পড়েন যে নির্দিষ্ট সময়ের কিছুটা পূর্বেই তাঁকে পুত্রকলত্রের সান্ত্বনাময় পরিবেশে ফিরে আসতে হয়।

কিন্তু মাতুলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, কেননা গুপ্ত ততদিনে হ'য়ে পড়েছেন ইংরেজ আমলের সেই স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত ভারতীয়ের অন্যতম, যারা রাজনৈতিক বা অন্য কোনো কারণে যৌবনে য়োরোপে চ'লে এসে, তারপর আর দেশে ফিরতে চাননি কিন্তু বিদেশেও স্থিতিলাভ করতে পারেননি। এক ভ্রাম্যমাণ বা ভাসমান জীবন এঁরা মেনে নিয়েছেন, য়োরোপের নানা রাজধানীতে ঘুরে-ঘুরে, নানা ভাষায় অভ্যস্ত হ'য়ে-হ'য়ে,

ছোটো-বড়ো বিপ্লবী দলের উপান্তে উপস্থিত থেকে, নানা বিচিত্র উপায়ে জীবিকার সংস্থান ক'রে, বিয়ে না-ক'রে, কিংবা করলেও ঘর বাঁধার দুশ্চেষ্টা না-ক'রে। বিশেষত, ১৯৩৫-এর পর থেকে য়োরোপের লোকেরা সাধারণভাবেই অনেক বেশি জঙ্গম হ'য়ে উঠেছিলো; যুদ্ধের নান্দীপাঠ শুনে প্রত্যেক জাতি তার প্রতিবেশীর বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছে, পরস্পরের ভাষা শিখছে সবেগে, ছদ্মবেশে গোয়েন্দাগিরিও চলছে—আবার অনেক সজ্জনের মনে এই ভাবনাটিও কাজ করছে যে যতটা সম্ভব এখনই ভ্রমণ ক'রে নেয়া যাক, কেননা একদিন হয়তো সব সীমান্ত হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যাবে। গুপ্ত, যিনি ১৯১৯-এ রাশিয়াতে গিয়ে পরের বছর বিতাড়িত হন সেখান থেকে, আর স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় অ্যাম্বুলেন্স কোর-এও যোগ দিয়েছিলেন, তিনি যে ১৯৩৮-এর য়োরোপে কোনো-এক অস্পষ্ট মাতুলের হাতে ধরা দেবেন, সেটা একেবারেই অসম্ভব ছিলো। যেমন মাছের পক্ষে জল, তেমনি তাঁর স্বভাবের পক্ষে সেই বৈদ্যুতিক সময়টি অনুকূল ছিলো। তারপর যুদ্ধের ছয় বছর লণ্ডনে কাটাতে হ'লো, অতি কষ্টে।

নানা উপায়ে জীবিকা অর্জন করেছেন তিনি। শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, গাইডের কাজ, দোভাষীর কাজ, যখন যেটা সুবিধে হয়েছে নিয়েছেন; ইংরেজি পড়িয়েছেন ইটালিতে, আই. সি. এস-এর ছাত্রদের বাংলা শিখিয়েছেন লণ্ডনে, প্রাচ্য বিষয়ক পুস্তকের সমালোচনা লিখেছেন ইংরেজি, ফরাশি ও জর্মান পত্রিকায়, কালিদাসের বাছা-বাছা অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ ক'রে ছাপিয়েছেন—সেটা বেশ ভালোই বিক্রি হয়, পেপার-ব্যাক-এও বেরিয়েছে। এ ছাড়াও ভারতীয় বিষয়ে খানতিনেক বই লিখেছেন, বি. বি. সি. ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে বক্তৃতা দেবার জন্যও তাঁর ডাক পড়েছে মাঝে-মাঝে, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনো-না-কোনো রকম সংযোগ কিছুটা

নিয়মিতভাবেই বজায় রেখেছিলেন। মাঝে-মাঝে অর্থাভাব হ'লেও মনের দিক থেকে কোনো অভাববোধ নিলো না, দেশে ফেরার চিন্তা কখনো মনে আসেনি। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে মাঝে-মাঝে তাঁর দেশের কথা মনে পড়তে লাগলো।

তাঁর 'জর্মান স্ত্রী'কে নিয়ে অনেক বলাবলি হয়েছে মুক্তিগ্রামে। কেন তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে আনেননি, স্ত্রীর বিষয়ে কর্থাবার্তাও কিছু বলেন না কেন, কেউ সে-বিষয়ে খোঁজ নিলে হা-হা ক'রে হেসে উঠে বলেন, 'আরে মশাই, আমার কি এক স্ত্রী—চার দেশে চারটে স্ত্রী আছে যে!' এ-রকম কথাবার্তা গার্হস্থ্য বাংলাদেশে কারো ভালো লাগে না; এ থেকে যে-সব অনুমান করা স্বাভাবিক সেগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখি না। বিস্তর গবেষণার পরে বিদ্যাপীঠে এ-রকম একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিলো যে আসলে উনি কখনো বিয়েই করেননি—ও-সব ভুয়ো কথা, প্রজাপতি হ'য়েই জীবন কাটিয়েছেন।

প্রোফেসর গুপ্তর মুখে আমি যা শুনেছিলাম তা থেকে বলতে পারি যে এই মন্তব্যের প্রথম অংশ সত্য; উনি অবিবাহিত। তাঁর জর্মান স্ত্রী একটা আইনের ভেল্কিমাত্র, যাকে বলে লীগেল ফিকশন। ম্যুনিক প্যাক্টের বছরে যখন জর্মানিতে ছিলেন তখন এক জর্মান মহিলা—চিত্রকর তিনি—দেশ থেকে বেরোবার উপায়রূপে এই ইংরেজের প্রজাকে বেছে নেন। আইনত বিয়ে হ'লো, মিসেস গুপ্ত নামে পাস-পোর্ট নিয়ে তিনি চ'লে এলেন 'স্বামী'র সঙ্গে লণ্ডনে, এসে ভারতীয় স্বামীর ওজর দেখিয়ে, চটপট ব্রিটিশ ন্যাশনালিটি নিয়ে নিলেন এবং সহৃদয়ভাবে করমর্দন ক'রে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন গুপ্তর কাছে। ডোভারের ট্রেনে তিনি তুলে দিলেন তাঁর 'স্ত্রী'কে—প্যারিসে যাচ্ছেন তিনি, চিত্রশিল্পীদের পক্ষে সেটাই যথার্থ স্থান। বলা বাহুল্য, তার আগে আইনমাফিক বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়েছিলো, আর দু-জনের মধ্যে দাম্পত্যসম্বন্ধ কখনোই স্থাপিত হয়নি।

অবশ্য এই ঘটনাটা নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অংশ, মুক্তিগ্রামে সকলের তা জানবার কথা নয়; এমনকি তাঁর 'জর্মান স্ত্রী'র প্রবচনটাও কারো কানে উঠতো না, যদি না তিনি নিজেই সেটা রাষ্ট্র করতেন। যা তাঁর নিজের বিরুদ্ধে যায়, এমন সব উক্তি উচ্চারণ করার দিকে বিশেষ একটু প্রতিভাই ছিলো ভদ্রলোকের; অনেক অমূলক কথাও চালিয়ে দিতেন ব'লে সন্দেহ করি, আর কতগুলো—যেমন ওই 'চার দেশে চার স্ত্রী', কথাটা তো স্পষ্টতই ঠাট্টা, যদিও বাংলা দেশের মফস্বলে সবাই সেটাকে 'সত্যের ছদ্মবেশ' ব'লে ভাবতে পারলেই সুখী হবে। তিনি এখানে আসার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সবাই জেনে গিয়েছিলো যে তাঁর জর্মান স্ত্রীকে তিনি রেখে এসেছেন—কারো মতে ইংলণ্ডে, কারো মতে ফ্রান্সে, আর কারো মতে সুইৎসার্লাণ্ডে—আর এই মতভেদের কারণ, প্রোফেসর গুপ্তই এক-একজনকে এক-এক রকম বলেছেন। 'আমার ছেলেমেয়ে দুটি; মেয়ের বয়স পনেরো আর ছেলের বারো'; 'একটি দশ বছরের মেয়ে আছে আমার'; 'না মশাই, ছেলেপুলে নেই, বুড়ো বয়সে বৌকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত আছি'—এই রকমের তিনটি খবর তিনি নিজেই নাকি পরিবেশন করেছেন ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির কাছে। কেন বলেছেন এ-রকম? আর আমি কেমন ক'রেই বা জানি যে এগুলোই বানানো, আর আমাকে একদিন নিভৃতে যা বলেছিলেন সেটাই সত্য? প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না, তবে এটা দেখেছি যে আমাদের ঔচিত্যবোধে আঘাত দিয়ে কথা বলতে তিনি একটু অন্যায়রকম ভালোবাসতেন; আর হয়তো যা সত্য নয়, স্ত্রী ও সন্তান পরিবৃত যে-জীবন কখনো তাঁর ভাগ্যে ঘটলো না, তার কাল্পনিক ছবি এঁকে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতেন। কে জানে, হয়তো ওই জর্মান মহিলাটিকে মনে-মনে ভালোই বেসেছিলেন তিনি, ভুলতে পারছিলেন না; তাঁকে জড়িয়ে কথা বলতেও ভালো লেগেছে। সুবিধে বুঝে নানা রকম রং চড়াতেন এই ছবিতে, তার কোনো-কোনো

অংশ নাবালকদের শ্রুতিযোগ্য নয়। এখানে বলা দরকার যে এ-সবের অনেকটাই তাঁর তীব্র ব্রাহ্মবিদ্বেষের ফল। ব্রাহ্মদের তিনি বলতেন ক্যালভিনিস্ট, যারা বিশ্বাস করে যে ধনীমাত্রেই পুণ্যাত্মা, কেননা, ঈশ্বরের কৃপা না-থাকলে ধনী হওয়া তো সম্ভব হয় না। এই বিদ্বেষের কারণও আমি অনুমান করতে পারি। তিনি নিজে ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মেছিলেন এবং ব্রাহ্ম হ'য়েও অন্য জাতে তাঁরা বিয়ে করতে দেননি ছেলেকে। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে তিনি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা চালাচ্ছেন, যে ব্রাহ্মদের স্বতন্ত্র কোনো সত্তা নেই আর, কিন্তু বাংলাদেশের ভাষায় ও ব্যবহারে আজকের দিনে যে-শালীনতা দেখা যায় সেটা তাঁদেরই দান। 'রেখে দিন, মশাই, শালীনতা—এখনো কী-সব বিয়ের বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপা হচ্ছে ছাখেন না?' 'কিন্তু হিন্দি ফিল্মের সঙ্গে বাংলা ফিল্মের তুলনা করুন!' আমি তর্ক করেছি। 'ওরা বোকা আর আমরা ন্যাকা—এই যা তফাৎ!' ব'লে অট্টহাস্য করেছেন গুপ্ত-সাহেব। 'আর ন্যাকামি অর্থ কী? ভান। ভান অর্থ কী? কপটতা। যাকে সহ্য করতে পারি না তাকে দেখে দেঁতো হাসি হাসতে হবে—এই তো শিখিয়েছে আপনাদের ব্রাহ্মধর্ম! অনেক, অনেক ভালো ছোরা নিয়ে তাকে তাড়া করা—মানেন এ-কথা?' এর পরে অনর্গল অনেকক্ষণ ব'লে গেছেন, আমাকে প্রতিবাদ করার সময় দেননি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর এখনো দেয়া হয়নি; কী ক'রে আমি জানি যে তাঁর 'জর্মান স্ত্রী' বিষয়ে আমাকে যা বলেছেন, সেটাই সত্য? প্রমাণ করতে পারবো না, কিন্তু আমার বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ের কথা শুনলেই চেনা যায়। অন্তত, নবেন্দু গুপ্ত যে-রকম কৌতুকপ্রিয়, রাগি ও খোলামেলা মানুষ, তাতে সত্যের সুরে মিথ্যে বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ব'লে আমি বিশ্বাস করি না।

এই লেখাটায় এমন একটা সুর এসে যাচ্ছে যেন আমি নবেন্দু গুপ্তর পক্ষ নিয়ে ওকালতি করতে নেমেছি। সেটা আমার একেবারেই অভিপ্রেত নয় তা বলবো না; কেননা তাঁর জন্য আমার মনের তলায় কিছু বেদনাবোধ জমা হ'য়ে আছে। কিন্তু এখানে বলা দরকার যে ভদ্রলোককে প্রথম দেখে যাদের ভালো লাগেনি, আমি তাদেরই একজন।

এর আগে বিদ্যাপীঠে ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন নটস নামে একটি ইংরেজ যুবক, যাঁকে আমি অল্পই দেখেছিলাম, আর যাঁর বিষয়ে কিছুই প্রায় জানি না। শুধু এটুকু জানি যে তিনি অক্সফোর্ডের ডিগ্রিধারী; আর 'অক্সফোর্ড' ও 'কেম্ব্রিজ' এ-দুটি নাম আমাদের দেশে এখনো জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। ইংলণ্ডের এই দুটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা আমার অবশ্য কারো চেয়ে কম নয়, কিন্তু কখনো-কখনো আমার মনে হয়েছে যে এই শ্রদ্ধাকে আমরা প্রায় কুসংস্কারে পর্যবসিত করেছি, ভাবটা মাঝে-মাঝে এই রকম দাঁড়িয়ে যায় যে সরস্বতী অক্সফোর্ডে এক পা ও কেম্ব্রিজে আরেক পা স্থাপন ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, জগতের অন্যান্য পীঠস্থানে ছড়িয়ে আছে শুধু তাঁর বাসি পদ্মের দু-একটা ছেঁড়া পাপড়ি বা তাঁর মৃত রাজহাঁসের ঝরা পালক। এই নটস-এর সঙ্গেই সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম একদিন (কেননা কারো সঙ্গে নতুন পরিচয় হ'লে তাঁর বিষয় নিয়ে কথা বলাটাই সৌজন্য); তিনি অক্সফোর্ডে ইংরেজি সাহিত্য প'ড়ে এসেছেন, কিন্তু ডরথি সেয়ার্স-এর দান্তে-অনুবাদ বিষয়ে তাঁর মত জিগেস করাতে জবাব দিলেন—'ডরথি সেয়ার্স? যিনি ক্রাইম-ফিকশন লেখেন?'—আর এতে আমি কিছুটা অবাক না-হ'য়ে পারিনি।

তবে, ইংরেজি সাহিত্য পড়লেই দান্তে বিষয়ে উৎসাহী হ'তে হবে তা হয়তো জোর ক'রে বলা যায় না—কেননা দান্তে ইংরেজ নন, ইটালিয়ান মাত্র—আর হয়তো অন্য সব দিকে অজ্ঞ থেকে শুধু একটা বিষয়ে আবদ্ধ হওয়াকেই বলে সত্যিকার 'অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন'। আর তাছাড়া, একটা ইস্কুলে পড়াতে এসে দান্তেকে জানার কী বা দরকার, ইংরেজি ব্যাকরণ জানলেই যথেষ্ট।

আমি বিদ্যাপীঠে আসার মাসখানেক পরেই নটস চ'লে গেলেন বম্বাইতে এক সওদাগরি আপিশে; তাঁর জায়গায় লোক খোঁজা হ'তে লাগলো। নটসের বিরোধী বা বিশেষ পক্ষপাতী কেউ ছিলেন না—ভদ্রলোকের অন্তত সেই গুণটি ছিলো যাতে মুক্তিগ্রামেও 'আলোচিত' না-হ'য়ে ছু-বছর কাটিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর জায়গায় নবেন্দু গুপ্তর নিয়োগের কথা যখন উঠলো তখন কার্যনির্বাহক সমিতির কোনো-কোনো সদস্য আপত্তি তুলেছিলেন। আপত্তির প্রধান কারণ এই যে গুপ্তর ডিগ্রি অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজের নয়, এমনকি ইংলণ্ডেরই নয়, সর্বন্-এর। এমনকি, কয়লা-খনির সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন সদস্য নাকি ব'লে ফেলেছিলেন—'ফ্রান্সে আবার পড়াশুনো কিছু হয় নাকি, ও তো আমোদপ্রমোদের জায়গা!' অবশ্য আরেকজন সদস্য তাড়াতাড়ি সে-কথাটাকে চাপা দিয়েছিলেন এই ব'লে—'না, না, আমরা তো ইংরেজির অধ্যাপক চাচ্ছি, ইংরেজ কেউ হ'লে ভালো হয় না? অন্তত, ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত?'—কিন্তু চিন্তামণি দত্তর কথার সামনে ও-সব ওজর-আপত্তি টিঁকলো না; বিদ্যাপীঠে তাঁর প্রেস্টিজ তখনো ঢিলে হয়নি।

নবেন্দু গুপ্তর কালিদাস-অনুবাদ প'ড়ে আমার ভালো লেগেছিলো, তার উপর তিনি চিন্তামণিবাবুর নির্বাচিত; তাই তাঁকে চোখে দেখার আগেই আমার মন অনুকূল হ'য়ে ছিলো তাঁর প্রতি। কিন্তু দেখে—কী বলবো—বিব্রত বোধ করলাম। তাঁকে যে-রকম ভাবা গিয়েছিলো

সে-রকম কিছুই তিনি নন ; তিনি যেমন, ঠিক তেমনটি কল্পনা করাই সম্ভব ছিলো না।

রোগা, লম্বা মানুষ, ছোটো ক'রে ছাঁটা শাদা চুলের তলায় মুখটি তিরিশ বছরের যুবকের মতো, সরু ফ্রেমের সোনার চশমার জন্য নাকটি অশোভনরকম তীক্ষ্ণ দেখায়। গাঢ় রঙের যেমন-তেমন একটা প্যাণ্ট পরনে, গায়ে দগদগে নীল, লাল বা হলদে রঙের হাওয়াই শার্ট, মোজা-ছাড়া পায়ে চপ্পল অথবা পাম্পশু। মাথায় বাঁকা ক'রে একটা খদ্দরের টুপি পরেন কখনো, আর শীতকালে কান-পর্যন্ত নামানো একটা ফরাশি গোল টুপি। এই অদ্ভুত সাজের পরামর্শ কে তাঁকে দিয়েছিলো জানি না, কোত্থেকেই বা ও-সব বর্ণিল বেশ সংগ্রহ করেছিলেন তাও আমার অজ্ঞাত। কিন্তু এই পোশাক মুক্তিগ্রামে তাঁর বন্ধুর কাজ করেনি।

যেন এই পোশাকের সঙ্গে মানিয়েই অন্য দু-একটা মুদ্রাদোষের তিনি চর্চা করেছিলেন। হাতে একটা মোটা লাঠি রাখেন সব সময়, ক্লাশেও যান তা নিয়ে ; পথে বেরিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে এমন লম্বা-লম্বা পা ফেলেন যেন লাঠির সাহায্যে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছেন। দ্রুত কথা বলেন, যেন সব সময় উত্তেজিত, একটা বাক্য ভালোমতো শেষ না-হ'তেই আর-একটা আরম্ভ করেন—আর পরিহাসকে এত বেশি প্রশ্রয় দেন যে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে কোনটা ঠাট্টা আর কোনটা মান্য তা সব সময় সহজে বোঝা যায় না। আর, বড্ড কথা বলেন—বড্ড মেশেন তাঁর অধীন শিক্ষকদের সঙ্গে, বড্ড আসা-যাওয়া করেন প্রিন্সিপালের বাড়িতে।

খুব কমিয়ে বললেও এ-কথা ঠিক যে বিদ্যাপীঠের অধিবাসীদের তিনি নিরাশ করেছিলেন। নৈরাশ্যের প্রধান কারণ : তাঁকে দেখে মনেই হয় না যে তিনি চল্লিশ বছর য়োরোপে কাটিয়ে এসেছেন। চল্লিশ বছর—অথচ একটুও 'সাহেবি' ভাবের মনে হয় না তাঁকে, এমনকি কাঁধ-

ঝাঁকুনি দেন না পর্যন্ত, যে-বিদ্যেটি তিন মাস বিলেতে কাটিয়েই অনেক বাঙালি চলনসইরকম শিখে নেয়। আমরা ধ'রে নিয়েছিলাম তাঁ'র গায়ের রং লাল-মেশানো ফর্শা হবে, কিন্তু দেখা গেলো তিনি রীতিমতো তাম্রবর্ণ। তিনি বণ্ড স্ট্রীটের কাপড় পরলে অনায়াসে মেনে নিতাম আমরা, আর পরিষ্কার ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে তো কথাই ছিলো না; কিন্তু ষাট বছরের শাদা চুলে ঐ ছেলে-ছোকরার মতো পোশাকটাকে বরদাস্ত করা সহজ হ'লো না। আমরা অবাক হতাম না, যদি তিনি সব সময় ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতেন—বরং এটাই যেন আশা করা গিয়েছিলো তাঁর কাছে, তাঁর মুখে 'মাঝে-মাঝে' বাংলা শুনে পুলকিত হবার জন্যেও তৈরি ছিলাম আমরা—কিন্তু ও হরি, এ যে দেখি আকছার বাংলা বলে, তাও একেবারে ঘরোয়া, ইডিয়ম-ঘেঁষা বাংলা, প্রবাদ-ট্রবাদ সুদ্ধু—বাংলার আধুনিক সাহিত্যে সর্বশেষ বড়ো বিতণ্ডাটি কী ঘটেছিলো, তারও খবর রাখেন, দেখছি। হয়তো এতেও আমরা একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম মনে-মনে, কেননা তাঁকে স্বদেশ বিষয়ে শিক্ষিত করার সুখ থেকেও তিনি বঞ্চিত করলেন আমাদের। আরেক কথা: তাঁর ইংরেজি উচ্চারণে অক্সফোর্ডীয় হাম্বারব নেই (কেউ অপরাধ নেবেন না, মন্তব্যটি এক বিখ্যাত অক্সনিয়ান ইংরেজ লেখকেরই); নটস যেমন শব্দের অর্ধাংশ কণ্ঠনালীতে আটকে রেখে ছাত্র ও সহকর্মীদের বিস্ময় উদ্রেক করতেন, তেমন কোনো লক্ষণ নেই গুপ্ত-সাহেবের; আমাদের পাঁচজনের মতোই পরিষ্কার ক'রে বলেন—আর সকলেই তা বুঝতে পারে। বাঙালির মতো চেঁচিয়ে কথা বলেন, জোরালো অঙ্গভঙ্গি করেন—ফিশফিশ ক'রে কথা বলার কায়দাটা পর্যন্ত য়োরোপ থেকে আয়ত্ত করতে পারেননি। মানতেই হবে, এই সবই নৈরাশ্যজনক হয়েছিলো।

এর অন্য দিক নেই তা নয়, হয়তো বা আমাদেরই বুঝতে ভুল হয়েছিলো। মুশকিল এই যে আমরা য়োরোপ বলতে এখনো ইংলণ্ড

দ্বীপটিকেই বুঝি, ইংরেজের মুদ্রাদোষ বা অক্ষমতাগুলিও, দেড়শো বছরের অভ্যাসের ফলে, আমাদের ভক্তিভাজন হ'য়ে আছে। য়োরোপ বলতে প্যারিস বা ভিয়েনা মনে পড়ে না আমাদের, মনে পড়ে না কাফে, অপেরা, খোলা হাওয়ার জীবন ; মনে পড়ে শুধু এক রক্তবর্ণ, নিঃশব্দ, নিরানন্দ ও কর্মিষ্ঠ জাতিকে। আগেকার দিনে যে-সব ভারতীয় দক্ষিণ য়োরোপে ভ্রমণ করেছেন তাঁদের লেখায় প্রায়ই পড়া গেছে যে মার্সাই বন্দর 'কলকাতার মতোই' নোংরা, বা ইটালিয়ানরা 'আমাদের মতোই' হাত-মুখ নেড়ে চেঁচিয়ে কথা বলে। 'আমাদের মতো'—সেটা নিশ্চয়ই একটা অপরাধ, কেননা আমরা কোনো জাতিগত দুর্বলতার জন্যই বিশ্বব্যাপারে এতটা পেছিয়ে আছি, ইংরেজের প্রধান গুণ সে 'আমাদের' ঠিক উল্টো, আর উল্টো ব'লেই অর্ধেক জগতের অধীশ্বর হ'তে পেরেছিলো। কই, ফ্রান্স বা ইটালি তো পারেনি। এই যুক্তি অকাট্য ; অতএব, যদি এমনও প্রমাণ হয় যে নবেন্দু গুপ্ত ফ্রান্স, জর্মানি ও ইটালির কাছে অনেক-কিছু শিখে এসেছিলেন, যে হ্বাগনার, বোদলেয়ার ও লেওপার্দি বিষয়ে সত্যি কিছু জানেন তিনি, জর্জ রূয়ো বিষয়েও যে-কোনো মুহূর্তে ঘণ্টাখানেক বুদ্ধিমান কথা বলতে পারেন, তাহ'লেও কোনো বিষয়েই 'ইংরেজের মতো' না-হওয়াটার ক্ষতিপূরণ হয় না।

আর তারপর, তাঁর পোশাক। আমাকে বলতেই হচ্ছে যে নানা বিষয়ে তাঁর পক্ষপাতী হ'য়েও, তাঁর পোশাকের সমর্থন আমি করতে পারিনি, এখনো পারি না। কোনো উগ্র ব্যক্তিবাদী যদি বলেন, 'কেন মশাই, আমি যদি লাল রঙের জামা পরি আপনার কী এসে যাচ্ছে তাতে ? লাল জামার বিরুদ্ধে কোনো আইন আছে কি ?'—আমি উত্তর দেবো, 'এটা আইনের কথা নয়, সামাজিক আচারের কথা। পর্ রুচি পর্‌না—এই প্রবাদ সব দেশেই আছে।' 'সব দেশেই ?' সেই ব্যক্তিবাদীর ব্যর্থ প্রতিবাদ আবার শুনতে পাচ্ছি আমি,

'রেনেসাঁসের ফ্লরেন্সের কথা ভাবুন—প্রত্যেকে তার নিজের খেয়াল-খুশিমতো বেশ ধারণ করছে, কারো পোশাক দেখে পেশা বোঝার উপায় নেই। আর বিশ শতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-পরিচ্ছদে জীবন কাটালেন, তার কি কোনো জুড়ি ছিলো পৃথিবীতে?'—কিন্তু এ-কথারও কি উত্তর দিতে হবে? রবীন্দ্রনাথকে সবই মানাতো, তার কারণ তাঁর প্রতিভা শুধু নয়, তাঁর আশ্চর্য চেহারা। আর আমাদের মনে রাখা দরকার যে এটা রেনেসাঁসের যুগ নয়, সেই ফ্লরেন্সও নেই আর, এখন সব সভ্য দেশেই নিয়ম হয়েছে য়ুনিফর্মিটি, বা য়ুনিফর্ম। দুঃখের বিষয়, ভ্যান গ, গোগ্যাঁ প্রভৃতির প্রকাশ্য বিদ্রোহের যুগও গত হয়েছে। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হলেন রিলকে, ভালেরি, পাস্টেরনাক, যাঁরা অজ্ঞাতবাস ক'রে নিজের কাজটি ক'রে গেছেন। তাই তো আধুনিক কবিতাকে দুর্বোধ্য হ'তে হ'লো, একটি প্রয়োজনীয় ও নিরপরাধ বেড়া তুলে দেবার জন্য। এ-যুগেও মনে-মনে আপনি স্বাধীন হ'তে পারেন, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করা চলবে না; ছদ্মবেশে থাকতে হবে, যাতে ভিড়ের মধ্যে 'আলাদা' ব'লে কেউ চিনতে না পারে আপনাকে, নয়তো টিকতে পারবেন না। নবেন্দু গুপ্ত পোশাকেই তাঁর 'বেআইনি' মনের বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলেছিলেন; সেটা দারুণ ভুল হয়েছিলো।

'কিন্তু নবেন্দু গুপ্ত তাঁর পোশাকের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথও ঠিক তা-ই করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখার স্টাইল, হাতের লেখা, আচার-ব্যবহার—সব-কিছুর সঙ্গে মিলিয়েই তাঁর বেশবাস রচনা করেছিলেন—তাঁর আচ্ছাদনও ছিলো পুষ্পিত, প্রচুর, সালংকার ও বিলসিত। তেমনি, নবেন্দু গুপ্তর চরিত্র, ব্যবহার ও কথাবার্তার মতোই তাঁর পোশাকও উগ্র, একরোখা ও ফর্ম্যালিটিহীন। যা একজনের বেলায় মেনে নিয়েছিলেন তাতে আরেক জনের বেলায় আপত্তি করেন কেন?'

—কিন্তু সব কথার জবাব দেয়া যায় না, কোনো-এক জায়গায় সীমা টানতেই হয়। যা রবীন্দ্রনাথকে মানিয়ে গেছে তা যে আর কাউকে মানাতে পারে না, এ-কথাও যারা বোঝে না, তাদের সঙ্গে তর্ক ক'রে নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার : এই কাহিনীটিকে শেষ করতে হবে।

কিন্তু ঐ অদ্ভুত পোশাক আর মুদ্রাদোষগুলো নিয়েও নবেন্দু গুপ্ত হয়তো আজ পর্যন্ত নিরুপদ্রবেই আমাদের মধ্যে থাকতে পারতেন, যদি না তাঁর বিষয়ে একটি ভয়ানক তথ্য প্রকাশ পেয়ে যেতো। তিনি আসবার পর অল্প দিনের মধ্যেই কারোরই জানতে বাকি রইলো না যে তাঁর মুখটাই শুধু যুবকের মতো নয়, মনটাও যুবকেরই থেকে গেছে। আর স্কুলে-কলেজে পড়ার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা সকলেই জানেন যে সে-সব স্থলে সবচেয়ে উপকারী হন তাঁরাই, যাঁরা বয়সে পঁচিশ হ'লেও মনে-মনে মহাস্থবির। তা নয় তো তারুণ্যের আতিশয্য সামলানো যাবে কেমন ক'রে? যদি মাষ্টার মশাই নিজেই নানা রকম নতুন ভাবনায় টগবগ করেন, তাহ'লে অর্বাচীনদের দশা হবে কী?

আরেকটি মহা দোষ গুপ্ত-সাহেবের: মনের কথা তিনি একেবারেই গোপন করতে পারেন না। 'অনেকদিন তো হ'লো, এবার বরং রবার্ট ব্রিজেস-এর বদলে একটা ওয়েন দেয়া যাক, মেসফিল্ডের বদলে একটা ইএটস'—এ-ভাবে বললে যে-পরিবর্তন হয়তো সহজেই সাধিত হ'য়ে যায়, সেটাকেই তিনি জটিল ক'রে তোলেন অনর্থক গোঁয়াতুর্মি করে। কিন্তু এই ঘটনাটি একটু বিশেষভাবে বলা দরকার।

কর্মভার নেবার পনেরো দিনের মধ্যে তিনি ঘোষণা করলেন ইংরেজি সাহিত্যের পাঠ্যসূচি বদল করতে চান। পাঠ্যসূচি বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্য বিদ্যাপীঠের নেই, কেননা ছেলেরা শেষ পরীক্ষা দেয় অন্য প্রতিষ্ঠানের অধীনে—তবু অন্যান্য স্কুলের মতোই, বহুদূর পর্যন্ত আমরা নিজেরাই পাঠ্যতালিকা বেছে নিই, এবং উপরের ক্লাশে কিছু বেশি বইও পড়িয়ে দেয়া হয়—এই আশায় যে ভালো ছেলেদের তা কাজে লাগবে। অতএব এই পাঠ্যসূচিটির গুরুত্ব

কিছু কম নয়, তা নিয়ে বেশ মাথা খাটাতে হয় আমাদের—অন্তত, তা-ই উচিত।

অভিজিৎও তখন নতুন যোগ দিয়েছে ইংরেজি বিভাগে, তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে গুপ্ত সাহেব নানা রকম বদল করলেন; যথাসময়ে তাঁর খশড়াটি উপস্থিত হ'লো বোর্ড অব স্টাডিজ-এ। প্রত্যেক বিষয়ের বাছা-বাছা অধ্যাপক নিয়ে এই বোর্ড গঠিত, যাতে এক বিভাগের কাজকর্মের খবর অন্যেরাও জানতে পারেন। খুব ভালো ব্যবস্থা, কিন্তু এতে একটু অসুবিধে এই যে কখনো-কখনো, দায়িত্বপালনের তাগিদে, কেউ-কেউ হয়তো এমন অনধিকারচর্চা ক'রে ফেলেন যা, ঐ বোর্ডের বাইরে, সুস্থ মস্তিষ্কে কখনোই তাঁরা করবেন না। উদাহরণ দিয়ে পাঠককে ক্লান্ত করবো না, কিন্তু তিনি সহজেই কল্পনা করতে পারবেন যে একজন পৌরনীতির অধ্যাপক, যিনি হয়তো সরলভাবে কবিতা বলতে ছেলেবেলায় পড়া সদ্ভাবশতক বোঝেন—তিনি হঠাৎ সাহিত্য বিষয়ে কোনো মন্তব্য করলে অন্যদের কেমন লাগে, বা ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে ছেলেদের কিছুটা ধারণা দেয়া যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে 'বাবা মহেশ্বরের মুখামৃত' নামক গ্রন্থ উল্লিখিত হ'লে কী-রকম বিড়ম্বনার কারণ ঘটে। অথচ, এ-সব বলার উদ্দেশ্য আর-কিছুই নয়, বিশুদ্ধ কর্তব্যপরায়ণতা; 'আমি এই সমিতির সদস্য, একটা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে, কিছু-একটা না-বললে কি ভালো দেখায়?'—অতএব মাথা খুঁড়ে এমন-কিছু বের করতে হয় যা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

আমার বয়স যদিও অল্প, সম্ভবত কড়া ডিগ্রির জোরে এই বহুমান্য বোর্ডের মধ্যে গৃহীত হয়েছিলাম। গুপ্ত-সাহেবের পাঠ্যসূচি পূর্বেই প্রচারিত হয়েছিলো, মীটিঙে আসবার আগেই কিছু-কিছু বিরুদ্ধ মন্তব্য কানে এসেছিলো। সভাস্থলে প্রথম প্রতিবাদ করলেন গোবিন্দবাবু, ইংরেজির দ্বিতীয় অধ্যাপক, যাঁকে এ-বিষয়ে পরামর্শ করা হয়নি ব'লে এমনিতেই মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে ছিলেন।

'রবার্ট ব্রিজেসকে বাদ দেয়াটা কি উচিত হ'লো?'

'ব্রিজেস কবিতা লেখেননি, পদ্য মিলিয়েছেন,' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন নবেন্দু গুপ্ত। 'আর ইংরেজি ভাষায় ভালো কবিতার সংখ্যা যদিও খুব বেশি নয়, অন্তত এর চাইতে ভালো কিছু আছে বইকি।'

সভাস্থলে চাঞ্চল্য ব'য়ে গেলো।

'কিন্তু ক্লাসিকল স্টাইলের একটা উদাহরণ হিশেবে—'

মীটিঙের মধ্যেই অট্টহাসি ক'রে উঠলেন গুপ্ত। 'ক্লাসিকল! একে আপনি ক্লাসিকাল বলেন! রবার্ট ব্রিজেস!'

হাসিটা অশোভন শোনালো, আর এর পরে ইংরেজি ভাষার অন্য অনেক লেখক, যাঁরা চঞ্চল মিছিল থেকে স'রে-স'রে আস্তে-আস্তে পাঠ্যকেতাবের নিরাপদ মফস্বলে আশ্রয় নিচ্ছেন, তাঁদের বিষয়ে নবেন্দু গুপ্ত যে-সব মন্তব্য করলেন সেগুলিও হৃদয়গ্রাহী হ'লো না। গোবিন্দ-বাবু, এবং আরো দু-তিনজন, পদে-পদে আপত্তি করলেন, ফলত তাঁদের এই সব মর্মবিদারক কথা শুনতে হ'লো যে ডি লা মেয়ার তৃতীয় শ্রেণীর কবি, আর আর্নল্ড বেনেটের নাটক পড়া মানে সময় নষ্ট। ও-রকম বলাটা নিশ্চয়ই গুপ্তর পক্ষে অবিবেচনার কাজ হয়েছিলো, কেননা কেউ যদি রবার্ট ব্রিজেস-এর কবিতা পড়ার পরেও তাঁকে ভক্তি করতে পারেন তাহ'লে নবেন্দু গুপ্তর কথা শুনে সে-ভক্তি টলবে না।

যা-ই হোক, প্রিন্সিপাল যখন বললেন, 'দেখা যাক না এই নতুনটাকে চেষ্টা ক'রে। সুবিধে না হয় আবার বদল করলেই হবে,' তখন আর-কেউ বড়ো আপত্তি করলো না; গুপ্ত-সাহেবের পাঠ্যসূচি গৃহীত হ'য়ে গেলো। গোবিন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে গুপ্ত-সাহেব বললেন, 'তা অনেক বছর এক জিনিশ পড়িয়ে তো অরুচিও ধ'রে যায়, আপনাদেরও একটা মুখ-বদল হবে। একটু খাটতে হবে হয়তো প্রথমে —তা কী আর করবেন।'

কয়েকদিন পরে লাইব্রেরির দিকে চলেছি, বেশ দূর থেকে গুপ্ত-

সাহেবের রক্তবর্ণ আংরাখা আমার চোখে পড়লো। আমি ভদ্রভাবে তাঁর শ্রুতিপথে পৌঁছবার কিছুটা আগেই তিনি হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'শুনুন তাপসবাবু, শুনুন—কথা আছে!' এতটা আগ্রহ-প্রকাশের প্রয়োজন ছিলো না, কেননা আমি যে তাঁকে দেখতে পেয়েছি তা তিনি জানেন, আর দেখতে পেয়ে পাশ কাটিয়ে চ'লে যাবো না এও তাঁর অজানা নয়। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াবার আগেই কথা আরম্ভ করলেন, 'শুনুন—এই অভিজিৎবাবুকে বলছিলাম কথাটা, আপনি কি জানেন যে এই বিদ্যাপীঠের ব্যাজ হ'লো দাড়ি? মস্ত লম্বা দাড়ি, মশাই, মনের মধ্যে সাত হাত গজিয়ে গেছে—জানেন না? এখনো ছেঁটে না-ফেললে কাক-চড়ুই বাসা বাঁধবে সেখানে—সেই এডওঅর্ড লিয়রের বুড়োর দশা আরকি!' ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

সামনেই টিচার্স ক্লাব, টিফিনের সময়, মাস্টার মশাইরা কেউ চা খেতে ঢুকছেন, কেউ বেরোচ্ছেন, বেশ সরগরম জায়গাটি। গুপ্ত-সাহেবের মন্তব্যটি কারো-কারো কানে গিয়ে থাকলে অবাক হবার নেই; বলতে বাধ্য হচ্ছি ও-রকম ক'রে বলাটা তাঁর উচিত হয়নি। সত্য হ'লেও সব কথা সব সময় বলা যায় না, এ-কথা তো শিশুও বোঝে সংসারে; শিশুকেও জানতে হয় যে মিথ্যার আশ্রয়েই আমরা বেঁচে-ব'র্তে থাকি। আর অভিজিৎ আর আমার মতো অর্বাচীনের সঙ্গে অত্যন্ত বেশি মেলামেশা করাটাও তাঁর পক্ষে বেঠিক কাজ হয়েছিলো।

আমি দেখাতে চাচ্ছি যে উল্টো পক্ষ বিষয়ে যা-ই বলা হোক, নবেন্দু গুপ্ত কোনো দোষ করেননি তা নয়। দেখাতে চাচ্ছি, তিনি যে এখানে আসবার কয়েকদিনের মধ্যে অধিকাংশের অপ্রিয় হ'য়ে উঠে-ছিলেন তার কারণ তাঁরই কতগুলো—ঠিক দোষ না হোক, অবিবেচনা, কিন্তু অবিবেচনাও মস্ত দোষ বইকি। মেটারনিখ বিষয়ে বলা হ'য়ে থাকে যে তিনি তাঁর ভৃত্যের সামনেও সারা জীবনে এমন একটি

কথা উচ্চারণ করেননি যা তিনি প্রকাশ্যে না-বলতে পারতেন। জানি, কূটনীতি আলাদা ব্যাপার, সাহিত্যে বা দর্শনে পণ্ডিত হ'লেই কূটবুদ্ধি বর্তায় না, বরং তার বিলোপের আশঙ্কা থাকে—তবু, কোনো 'দায়িত্বপূর্ণ কাজ' 'কৃতিত্বের সঙ্গে' সম্পাদন করতে হ'লে মেটারনিখের গুণটি ছিটে-ফোঁটা থাকা চাই তো। মনের কথা সব সময় প্রকাশ করতে পারেন এক সাধু সন্তরা আর পারে যারা সংসারের তুচ্ছ অভাজন—যারা দু-পয়সার চা আর একটি খবর-কাগজ নিয়ে নেহেরু থেকে আপিশের বড়োবাবু পর্যন্ত জগৎটাকে চুরমার ক'রে দিলেও কারো কিছু এসে যায় না। কিন্তু যাঁরা সংসারে আছেন এবং সংসারে থেকে 'উন্নতি' করেছেন তাঁদের সেই স্বাধীনতা নেই।

আমি আমার নিজের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, কেননা আমি এই ঘটনা-গুলোর দর্শকমাত্র, আমি এখানে না-থাকলেও যা হয়েছে ঠিক তা-ই হ'তো। কিন্তু ঘটনার ক্রমবিকাশে যার প্রত্যক্ষ কিছু অংশ ছিলো সে হচ্ছে অভিজিৎ। আর—কথাটা না-ব'লে পারছি না—অভিজিতের প্রতি গুপ্ত-সাহেবের স্পষ্ট পক্ষপাত প্রথম থেকেই ঠিক ততটাই দৃষ্টি-কটু হয়েছিলো, যতটা চিন্তামণি দত্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। ইংরেজি বিভাগের কনিষ্ঠ শিক্ষক অভিজিৎ, না-হয় বুদ্ধিমান ছেলেই, কিন্তু বলতে গেলে গুপ্তর নাতির বয়সী, সহকর্মীদের মধ্যে আর কি তিনি কাউকে খুঁজে পেলেন না মেলামেশার যোগ্য? 'আরে মশাই ছেড়ে দিন, প্রিন্সিপালের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম—আমরা তো চুনো-পুঁটিমাত্র!'

বাঙালি অতি চালাক জাতি—হেলে ধরতে ওস্তাদ, হয়তো সেই-জন্যেই তার চোখের সামনে দিয়ে কেউটেগুলো পালিয়ে যায়। চালাকির একটি লক্ষণ সন্দেহ; আর বাঙালি সন্দেহে সুতীক্ষ্ণ—অন্তত ছোটো-ছোটো বিষয়ে। অর্থাৎ—বাঙালির সংশয় নেই, শুধু সন্দেহ আছে। 'ভগবান আছেন কি নেই', 'লোকেরা যাকে পাপ বলে সেটা

সত্যি পাপ কিনা,' '"উন্নতি" বা "প্রগতি" শব্দের অর্থ কী'—এ-সব প্রশ্ন সাধারণত বিব্রত করে না তাকে, কিন্তু একবার যদি তার কানে আসে যে অমুকবাবুর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সদ্ভাব নেই তাহ'লে সেই খবরটার ভিত্তিহীনতায় কিছুতেই আর বিশ্বাস করতে চায় না ; কিংবা যদি খবর পায় যে কেউ কোনো ভালো বই লিখেছে তাহ'লে সেটা অপ্রমাণ করার জন্য কোমর বেঁধে লেগে যায়—অনেক সময় বইখানা না-প'ড়েই। বাঙালির ভাষার একটি প্রিয়তম শব্দ হ'লো 'পক্ষপাত' ; কোনো নতুন বইয়ের প্রশংসা কোথাও ছাপা হ'লে তৎক্ষণাৎ সেটাকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' ব'লে উড়িয়ে দেয় ; কারো কোনো ভালো চাকরি হ'লে 'পক্ষপাত' সন্দেহ করে ; বন্ধুতা বা শাদাশিধে ভালো লাগাকেও ঐ নামে চিহ্নিত ক'রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ না-দেখিয়ে পারে না। বইয়ের যদি নিন্দে বেরোয়, চাকরি যদি না জোটে—সেটাই, বাঙালির অভিধানে, 'পক্ষপাতদুষ্টতা' থেকে মুক্ত। 'মশাই, আপনার আস্পর্ধা তো কম নয় ; ক-কে আপনার ভালো লাগে আর আমাকে লাগে না!' এই কথাটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাংলাদেশে যতবার ধ্বনিত হয় তেমন বোধহয় পৃথিবীর আর-কোনো দেশেই হয় না।

অথচ, এমনি মানুষের স্বভাব, যে সকলকে সমান ভালো লাগে না, বা সব জিনিশ সমান ভালো লাগে না, কিছু-না-কিছু 'পক্ষপাত' সকলেরই আছে। এমনও বলা যায় যে পক্ষপাতটাই রুচি আর রুচিই মনুষ্যত্ব। কিন্তু মনুষ্যত্বই এক জিনিশ, কর্মজীবনই আর। 'অফিশিয়াল' ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দকে 'ব্যক্তিগত' মনে করাই বিধেয়, আর 'ব্যক্তিগত'কে যতদূর সম্ভব দূরে রাখাই সমীচীন। জানি, মানুষ মানুষমাত্র, হিশেব তৈরির নির্ভুল যন্ত্র নয় ; তবু, অন্তত মৌখিকভাবে, অন্তত আদর্শ হিশেবে, 'নিরপেক্ষতা'কে স্বীকার না-করলে নানারকম গোলযোগের সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। গুপ্ত-সাহেব সেই ভুলই করেছিলেন।

'অভিজিৎকে আমার ভালো লাগে, নাতালীকে আমার ভালো লাগে, চিন্তামণিবাবুর সঙ্গে কথা ব'লে আমি সুখ পাই ; তাতে আপনার কোনো পাকা ধানে মই দিচ্ছি না তো! চাকরি করতে এসেছি ব'লে আমার কি বন্ধু থাকতে নেই? আমি কি আমার আত্মাকে বেচে দিয়েছি?' এ-সব কথা বলতে খুব ভালো, শুনতেও খুব ভালো, কিন্তু—এতে কাজ চলে না। বিশেষত, মুক্তিগ্রামের মতো ছোটো জায়গায়, যেখানে সকলে অন্য সকলের চোখের তলায় বেআব্রুভাবে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়—আর 'নিজেদের' বাইরে আর-কোনো মেলামেশাও নেই, সেখানে যে-গুণটির সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা সতর্কতা। এখন, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে চিন্তামণি দত্তের কথা শোনার অধিকার সকলের থাকলেও, তাঁর সঙ্গে কথা বলার যোগ্যতা সারা মুক্তিগ্রামে এক গুপ্ত-সাহেবেরই ছিলো ; কিন্তু যিনি এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, আর যাঁকে দিনরাত বাস করতে হচ্ছে একেবারে প্রকাশ্যভাবে, তাঁর পক্ষে এই নির্বাচন যে 'পক্ষপাতদুষ্টতা'র লক্ষণ ব'লে গণ্য হবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ কী! সত্য, চিন্তামণিবাবু কখনো কাউকে ফিরিয়ে দেননি ; বরং অনেককেই আমন্ত্রণ করেছেন সে-সব কথাবার্তায় যোগ দিতে—কিন্তু দু-একদিন গিয়েই অন্য সবাই বিরত হয়েছিলেন, কেননা 'সারাদিনের খাটুনির পরে আবার ও-সব বড়ো-বড়ো কথা ভালো লাগে না, মশাই।'—কিন্তু নগ্ন তথ্যটা এই থেকে গেলো যে প্রিন্সিপাল-সাহেব তাঁর প্রিয়পাত্র বিশেষ-একজন অধ্যাপকের সঙ্গে অনেক রাত অবধি গল্প ক'রে কাটান—আর তাতে অন্যদের মনঃপীড়ার কারণ ঘটবে সে-বিষয়ে সন্দেহ কী।

গুপ্ত যখন এলেন তখন তাঁর মর্যাদার উপযোগী কোনো বাড়ি খালি ছিলো না। একা মানুষ, ছোটো বাড়িতে থাকতে আপত্তি ছিলো না তাঁর, কিন্তু প্রিন্সিপাল তাঁকে নিজের বাড়িতে রাখলেন। একটি বাড়ি আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিলো, সেটি শেষ হ'লেই উঠে যাবেন

ব'লে ঠিক হ'লো। (এই কথাটা 'সারথি'তে এমনভাবে ছাপা হয়েছিলো যেন চিন্তামণি দত্ত 'বন্ধু'র জন্য বিশেষ আরামদায়ক বাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন বিদ্যাপীঠের খরচে, তাতে নাকি এয়ার-কণ্ডিশণ্ড ঘর করারও পরিকল্পনা ছিলো।) শোনা যায়, কিছুদিন পরে সেক্রেটারি একদিন গুপ্তকে বলেছিলেন, 'চিন্তামণিবাবুর ওখানে আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি?' 'না, না, কিছু অসুবিধে নেই। 'অসুবিধে' হ'লে বলবেন—আমার ওখানেও থাকতে পারেন ইচ্ছে করলে; অনেক জায়গা আছে, আমার গাড়িতেই যাওয়া-আসা করবেন।' 'থ্যাঙ্কিউ, মোস্ট কাইণ্ড অব ইউ—কিন্তু আমি বেশ আছি।' গুপ্ত বোঝেননি, কিন্তু চিন্তামণিবাবু বুঝলেন যে ব্যবস্থাটা অনেকের পছন্দ হচ্ছে না। কয়েকদিন পরে গুপ্ত চ'লে গেলেন ডাক্তার চ্যাটার্জির বাড়িতে, যদিও তার পরেও তাঁদের নৈশ কথোপকথনের অবসান হ'লো না। অভিজিৎ তার নিজের ঘরটি গুপ্ত সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে, ব্যাচিলার্স কোয়ার্টার্সে আমার পাশের ঘরে এসে উঠলো। আমি তাতে অত্যন্ত সুখী হলাম, কিন্তু সেই থেকেই আরেকটি জট বাঁধলো এই কাহিনীতে।

॥ পাঁচ ॥

নবেন্দু গুপ্ত ডাক্তারের বাড়িতে যাওয়ার পর থেকে যতদিন না সেই ঘটনাটি ঘটলো যাতে তিনি বিদ্যাপীঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন—এই মাস ছয়েক সময় আমার জীবনের একটি সুখস্মৃতি হ'য়ে থাকবে ; আমি জানি, ষাট বছর বয়সে অতীতের যে-সব দিনগুলির কথা মাঝে-মাঝে মনে আনতে আমার ভালো লাগবে, এগুলি তারই অন্তর্ভূত। চিন্তামণি দত্তকে এত বেশি সমীহ করি আমরা (অভিজিতের আর নিজের কথা বলছি) যে, খুব লোভ থাকা সত্ত্বেও, তাঁর কাছে ঘন-ঘন যেতে সংকোচ বোধ করি, আর তাছাড়া—আগেই বলেছি—সাবধানে চলতে হয় পাছে কেউ আমাদের 'প্রিন্সিপালের পেয়ারের' ব'লে সন্দেহ করে। কিন্তু ডাক্তার চ্যাটার্জির কাছে সে-ভয় নেই, মানুষও তিনি খুব মিশুক ধরনের, আর তাঁর স্ত্রীর আতিথেয়তার কথা বলতে গেলে লেখাটার আয়তন অনেক বেড়ে যাবে। সংক্ষেপে বলি, বিদ্যাপীঠের ঐ প্রান্তিক বাড়িটিতে আমরা চমৎকার আড্ডা জমিয়েছিলাম ; তার প্রধান বক্তা যদিও গুপ্ত-সাহেব, কাউকেই নীরব হ'য়ে থাকতে হ'তো না ; আর যেটুকু কথা বাকি থাকতো (কেননা কোনো 'বিষয়' নিয়ে আলোচনা হ'লে সহজে কথা ফুরোতে চায় না, বিশেষত যুবা বয়সে), তা অভিজিৎ আর আমি পুরিয়ে নিতে পারতাম মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে ফিরতে-ফিরতে, আর কখনো বা, ব্যাচিলার্স কোয়ার্টার্সে ফেরার পরেও, অনেক রাত অবধি জের চালাতাম তার। মাঝে-মাঝে বটব্যাল এসে যোগ দিতেন ; তাঁর ও আমার মধ্যে যে-আলাপের বিবৃতি ইতিপূর্বে দিয়েছি তা সম্ভব হ'তো না, যদি না এই সময়টায় প্রায়ই আমার দেখাশোনা হ'তো তাঁর সঙ্গে। আমার মতো, তিনিও এই ঘটনাগুলির একজন নিষ্ক্রিয় সাক্ষী। সেটাই তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্র।

আমাদের এই সান্ধ্য আড্ডায় বেশ একটি বড়ো অংশ নিতো নাতালী দে, তাতে আমি প্রথমে কিছু অবাক হয়েছিলাম। কেননা, তার বিষয়ে শুনে আর দূর থেকে তাকে দেখে আমার ধারণা হয়েছিলো যে সে বিষণ্ণ ও আত্মসমাহিত মানুষ—পশু অথবা শিশু না-হ'লে তার সান্নিধ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু এবার দেখলাম সে বয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশা জানে, যা শোনার যোগ্য তা শুনতে জানে, আর তার নিজেরও কিছু বলবার নেই তাও নয়। আস্তে-আস্তে তার মধ্যে একটি পরিবর্তন লক্ষ করলাম আমি, তাঁর মনের একটা অংশ, যা এতদিন পাথরে চাপা ছিলো, তা যেন খুলে গেছে এবার, খোলা গলায় হাসে, হালকা গান শোনায়, হাইনের কবিতা আবৃত্তি করতে-করতে চোখ দুটি উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। তার বয়স যেন ক'মে এলো, বেশবাসে ও প্রসাধনে লক্ষণীয় উন্নতি হ'লো। হঠাৎ আমি একদিন আবিষ্কার করলাম যে তাকে সুন্দরী বললে ভুল হয় না।

এই পরিবর্তনের কারণ হিশেবে নবেন্দু গুপ্তকেই ধ'রে নিতে হবে, কেননা নাতালীর বাইরের অবস্থা আগে যা ছিলো এখনো তা-ই আছে; তার মধ্যে নতুন যোগ হয়েছে শুধু গুপ্ত-সাহেব। গুপ্তর প্রতি বিশেষ যত্ন নাতালীর; আমাদের কাছে প্রায়ই বলেন, 'আশ্চর্য মানুষটি —না? কিন্তু বড়ো অসহায়, একেবারে শিশুর মতো। তাঁকে অনেক দেখাশোনা করা দরকার।' আমি যখন হেসে বলেছি যে যে-মানুষ বিদেশে স্বাবলম্বী হ'য়ে চল্লিশ বছর কাটাতে পেরেছে তাকে অসহায় বলা যায় কী ক'রে, নাতালী জবাব দিয়েছে, 'না, ও-রকম নয়। উনি কলকাতার টিকিট কিনে ভুল ট্রেনে উঠে পাটনা চ'লে যাবেন না, কিন্তু কেউ যদি কখনো হাত বাড়িয়ে দেয় সে-হাত তিনি দুই হাতে চেপে ধরবেন। আর পৃথিবীতে যারা হাত বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছুক, সংখ্যায় তারা এত কম—এত কম!'

আমি অনুমান করতে পারি যে গুপ্ত আর নাতালী, এই দুটি

মানুষ প্রায় দেখা হওয়া মাত্রই পরস্পরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তার কারণ কি শুধু এই যে দু-জনেই নির্বাসিত, উদ্বাস্তু, পারিবারিক বন্ধনহীন? না কি নাতালীর মধ্যে একটি হৃদয়কে দেখতে পেয়েছিলেন গুপ্ত-সাহেব, যে-হৃদয় বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বিষাক্ত হ'য়ে যায়নি, বরং দুঃখের চাপে যার স্পন্দন আরো দ্রুত হয়েছে? আর নাতালী কি গুপ্তকে দেখেই বুঝেছিলো যে এই মানুষটির চুল শাদা হ'য়ে গিয়ে থাকলেও, তাঁর জন্য আরো দুঃখ অপেক্ষা ক'রে আছে?

এই দু-জনের নাম জড়িয়ে মুক্তিগ্রামে একটা 'কেলেঙ্কারি' ছড়াতে পারতো, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তা হয়নি। তাই ব'লে এমন অনুমানের ভিত্তি নেই যে এঁদের বন্ধুতাকে কেউ প্রসন্ন চোখে দেখেছিলো; এই তুচ্ছ ও অপ্রীতিকর ব্যাপারটা যখন সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে তখন বিদ্যাপীঠে শোনা গিয়েছিলো যে 'গুপ্তকে উচ্ছেদ করাই আসল কথা, তারপর নাতালীকে পোকার মতো টিপে মারা যাবে।' যাকে অবলম্বন ক'রে মুখবন্ধ হ'লো তার নাম মালতী ঘোষ।

মালতী ঘোষ শ্রীমতীর ছাত্রী, একটু বেশি বয়সে আই. এ. পড়ছে। বয়স বেশি হবার কারণ, নয় থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত সে ইংলণ্ডের স্কুলে পড়েছিলো; দেশে ফিরে দেখলো মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞতার দরুন তার স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা নেই। তার বাবা স্বাধীনতার পরের বছরেই ফরেন সার্ভিসে ঢুকেছিলেন; বদলির চাকরির অনিশ্চয়তা এড়াবার জন্য মেয়েকে প্রথম থেকেই রেখে দেন সাসেক্স-এর এক বোর্ডিংস্কুলে, ছুটিতে দেখাশোনা হয়। একমাত্র সন্তান, বিশেষ আদরের, তার শিক্ষার জন্য যত্নের কোনো ত্রুটি করেননি তার বাবা; বাড়িতে যথাসম্ভব বাংলার চর্চাও রেখেছিলেন; কিন্তু মেয়ে বড়ো হ'তে-হ'তে তাঁর দুশ্চিন্তা হ'লো পাছে মেয়ে বাংলা ভাষায় পটু না হয়, বাঙালির সঙ্গে মিশতে না পারে, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে নিজের দেশ থেকে। কোনো ছোটো দেশের রাষ্ট্রদূতের পদে ওঠার সম্ভাবনা তাঁর

দেখা দিয়েছিলো, কিন্তু, শুধু মেয়ের কথা ভেবেই, তিনি ফরেন সার্ভিস ছেড়ে দিলেন, বিস্তর ধরাধরি ক'রে ভারত-সরকারেরই এমন একটি বিভাগে বদলি হলেন যার দপ্তর কলকাতায়। ইংরেজিকে মাতৃভাষা ব'লে ঘোষণা ক'রে সেই বছরেই স্কুল-ফাইনাল পাশ করা অসম্ভব ছিলো না মালতীর পক্ষে, বরং সুসাধ্যই ছিলো, কিন্তু মিস্টার ঘোষ তা হ'তে দিলেন না; বাড়িতে মাষ্টার রেখে, এবং প্রচুর সাহিত্যের সাহায্যে, ছু-বছর ধ'রে বাংলা শেখানো হ'লো তাকে, স্কুল-ফাইনাল পাশ করতে-করতে আঠারো পেরিয়ে গেলো। আই. এ. পড়ার জন্য মেয়েকে পাঠিয়ে দিলেন শ্রীমতীতে; স্থানীয় অভিভাবকরূপে মহীতোষ চ্যাটার্জির নাম দিলেন, আমাদের ডাক্তার-সাহেবের সঙ্গে অনেকদিনের বন্ধুতা তাঁর। মাঝে-মাঝে সুবিধেমতো মা-বাবা এসে মেয়েকে দেখে যান, কিন্তু আসতে না-পারলেও এ-কথা ভেবে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকেন যে সপ্তাহে অন্তত ছুটো দিন মেয়ে একটি পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে কাটাতে পারছে। উপরন্তু, বাঙালি আবহাওয়ায়, যা, কলকাতাতেও, তাঁদের বন্ধু বা আত্মীয়মহলের মধ্যে খুব সুলভ নয়।

আর এমনি ক'রেই এটা ঘটলো যে আমাদের পূর্বোক্ত আড্ডাটিতে, সপ্তাহে ছু-দিন ক'রে, আমরা মালতীর সঙ্গ পেতে লাগলাম। শনি ও রবি ছু-দিনই পুরো ছুটি থাকে এখানে; শুক্রবার বিকেলে ডাক্তার মুখার্জি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসেন; ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি পাঠালে সুভদ্রা দেবী ছাড়বেন না—এ-সব বিষয়ে একটু কড়াক্কড় আছে শ্রীমতীতে—আবার রবিবার রাত্রে দশটার আগে পৌঁছিয়ে দেন, কেননা সকাল সাড়ে-আটটাতেই ক্লাশ আরম্ভ। এইভাবে অভ্যস্ত হ'তে-হ'তে শুক্রবারের রাত্রিটি আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের হ'য়ে উঠলো, শনিবারও খুব ভালো, কিন্তু রবিবারটা মন-মরা—সন্ধে থেকেই সোমবার শুরু হ'য়ে গেছে।

অভিজিৎ আর মালতী যে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়ছে

সেটা—আমরা যে-ক'জন সেখানে যাতায়াত করি, অল্পদিনের মধ্যেই বুঝে ফেললাম। আর তারাও তা গোপন করার কোনো চেষ্টা করলে না। কোনো অশোভন ব্যগ্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না কখনো, কিন্তু আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপের আভা ফুটে বেরোলে যেমন হয়, তেমনি একটা উদ্ভাস যেন অনুভব করি আমরা—ওরা দু-জন আমাদের সঙ্গে থাকে যখন। আর সেইজন্যই সন্ধ্যাগুলো যেন আরো সুন্দর ও সানন্দ হ'য়ে ওঠে।

আমি যদি দার্শনিক হতাম তাহ'লে ভালোবাসা বিষয়ে একখানা বই লিখতাম। আমার বক্তব্য হ'তো এই যে ভালোবাসার চেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা মানুষের আর-কিছুই নেই, কিন্তু ভালোবাসার চেয়ে কঠিন কাজও আর-কিছু নেই। মানুষের মতো জীব, যে ব্যাধি, জরা, মূঢ়তা, অক্ষমতা প্রভৃতি বিকার এড়াতে পারে না, তাকে ভালোবেসে তৃপ্ত হওয়া যায় কেমন ক'রে; আর তার ভালোবাসাও নিশ্চয়ই সেই পরিমাণেই খণ্ডিত, যতটা সে নিজে। অথচ, মানুষের চাইতে ভালো-বাসার যোগ্য কী-ই বা আর আছে পৃথিবীতে; আর, সব মানুষই কিছু-না-কিছু অপূর্ণ ব'লে, কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্য, একজন হয়তো আরেকজনকে ভালোবাসতে পারে। কিন্তু অন্য একজনকে আমরা যে—অন্তত সাময়িকভাবে—ভালোবাসতে পারি সেটা আসল কথা নয়; অন্যদের ভালোবাসাকেও ভালোবাসতে পারি কিনা, আসল পরীক্ষা সেইখানে। আর সে-পরীক্ষায় সব সময় উত্তীর্ণ হ'তে পারে, এমন মানুষ ক-জন জন্মায় এই পৃথিবীতে? অনেক সময়ই ভালোবাসা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত কয়েকটি বৃত্তির জন্ম হ'য়ে থাকে: যেমন ঈর্ষা, যেমন বিদ্বেষ, যেমন লুব্ধতা—আর সেগুলিও কম পরাক্রান্ত নয়।

পচা ডোবায় ঢিল ছুঁড়লে পরিচ্ছন্ন কতগুলো বৃত্ত রচিত হয় না, জলটা আরো ঘুলিয়ে ওঠে, ব্যাঙাচি, জোঁক ও সাপেদের মধ্যে খুব একটা চাঞ্চল্য প'ড়ে যায়। অভিজিৎ ও মালতীর প্রকাশ্য হৃদ্যতা

সেই রকম ঢিলের কাজ করলে বিদ্যাপীঠে। মালতী যে-দু'দিন থাকে, অভিজিৎ তাকে নিয়ে সূর্যাস্তের সময় মাঠের পথে বেড়ায় খানিকক্ষণ, সঙ্গে আর-কেউ থাকে না ; সকলেই তাদের দেখতে পায়। প্রথমে মালতীকে মুখার্জিদের কোনো আত্মীয় ব'লে ভেবেছিলো ওরা, কিন্তু যেদিন জানা গেলো সে শ্রীমতীরই ছাত্রী, এবং কারো কোনো আত্মীয়ও নয়, সেদিনই 'কর্তব্যের আহ্বান ধ্বনিত' হ'লো।

এর আগে মুক্তিগ্রামে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। আগেই বলেছি, বিদ্যাপীঠ আর শ্রীমতী একই পরিচালনার অধীন হ'লেও দুয়ের মধ্যে মুখ-দেখাদেখি নেই ; ছেলেদের আর মেয়েদের খুব যত্নের সঙ্গেই আলাদা রাখা হয়। মাঝে-মাঝে কথা উঠেছে যে এতটা কড়াক্কড় হয়তো ভালো নয় ; আজকাল তো কো-এডুকেশনাল স্কুলও হচ্ছে ; উৎসবে অনুষ্ঠানে মাঝে-মাঝে আসুক না মেয়েরা বিদ্যাপীঠে, আলপনা দিক, গান করুক, কি বিশেষ-বিশেষ দিনে ডাইনিং হল-এ পরিবেশন করুক—এগুলোও তো শিক্ষার একটা অঙ্গ। কথা উঠেছে, কিন্তু সুভদ্রা দেবী কঠিন হাতে ঠেলে দিয়েছেন প্রস্তাবগুলোকে ; 'আমি থাকতে এ-সব ব্যভিচার হ'তে পারবে না'—ঐ এক কথা তাঁর। 'ব্যভিচার' কথাটা এখানে হয়তো অসংগত, কিন্তু বহুমান্য সুভদ্রা দেবীর কথার উপর আমি কোনো কথা বলবো না।

অবশেষে, স্বয়ং লীলারামজীর মধ্যস্থতায়, সুভদ্রা দেবী এটুকুতে রাজি হলেন যে বছরে দু-বার, ছেলেরা যখন ছুটির আগে নাটক করে, তখন শ্রীমতীর ছাত্রীরা সেই নাটক দেখতে আসবে। (উল্টোটা, অর্থাৎ মেয়েদের নাটক দেখতেও ছেলেরা যাবে, এতে তিনি পাথরের মতো অনড় থাকলেন।) অতএব এ-কথা এখন আর বলা যাবে না যে এখানে ছেলেদের আর মেয়েদের মধ্যে 'মুখ-দেখাদেখি নেই'। দেখতে পায় বইকি ছেলেরা ; বছরে দু-বার বাস্-বোঝাই মেয়েরা আসে তাদের প্রিন্সিপাল, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, প্রোফেসর প্রভৃতির

সমভিব্যাহারে, দড়ি দিয়ে আলাদা-করা স্বতন্ত্র আসনে ব'সে নাটক দ্যাখে, হাসির জায়গায় বেশি হাসে না, রঙ্গমঞ্চ ছাড়া অন্য কোনো দিকে তাকায় না; তারপর, নাটকটি শেষ হওয়ামাত্র, বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত ছাত্রদের (হয়তো বা যুবক শিক্ষকদেরও) দীর্ঘশ্বাস সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে অধোমুখী হ'য়ে বাস্-এ উঠে নিজেদের দুর্গে ফিরে যায়। মুক্তি-গ্রামের মহিলাবিভাগের পক্ষে সুভদ্রা দেবী ভগবানের মতোই ভয়ংকর; তাঁর যাতে অনুমোদন নেই এমন কোনো ক্ষুদ্র কাজ করতেও—শুধু ছাত্রীরা কেন,—অধ্যাপিকারাও ভরসা পান না কখনো। শুনেছি, ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে এখানকার কোনো-কোনো অধ্যাপকের শ্রীমতীর কোনো-কোনো অধ্যাপিকার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু কর্মস্থলে ফিরে এসে উভয় পক্ষই সে-খবরটি সম্পূর্ণ চেপে গিয়েছেন।

আমি দুঃখিত যে আমার আখ্যানের এই অংশটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য শোনাচ্ছে না; মনে হচ্ছে যেন পঞ্চাশ বছর (বা অন্তত তিরিশ বছর) আগেকার কোনো ছেঁড়া পাতার নকল ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু একই সময়ে অনেকগুলি যুগ পাশাপাশি বিরাজ করতে পারে না কি? পাঠক কি জানেন না, স্ট্রিম-লাইন্‌ড্ টেবিলের পিছনে, নাইলন শার্টের আড়ালে, কত মন জরায় আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়ে আছে? এমন বাড়ি কি দ্যাখেননি, কর্তা যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় নামজাদা ক্লাবে গিয়ে স্কচ হুইস্কি পান করেন, কিন্তু সকালে ঠাকুরঘরে অন্তত আধঘণ্টা কাটিয়ে তবে জলস্পর্শ করেন? কিংবা এমন বাড়ি, যার ছেলেরা বক্তৃতার বোমা ফাটিয়ে এশিয়াকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলছে, অথচ লাখ টাকার সম্পত্তি না-নিয়ে একজনও বিয়ে করছে না? অতএব—আমি যা বলছি, তাতে অবাক হবার কী আছে?

যারা প্রায় স্বর্গের দেবীর মতোই দুর্লভদর্শন, তাদেরই একজনকে প্রকাশ্য দিবালোকে ক্যাম্পাসের মধ্য দিয়ে (কি ঠিক বাইরে দিয়ে) অতি সহজে হাঁটতে দেখে ছেলেরা অভিভূত হ'য়ে পড়লো। আর

তাও বাবার সঙ্গে নয়, মায়ের সঙ্গে নয়, একদল মেয়ের মধ্যে নয়, একজন যুবকের সঙ্গে—আর সে-যুবক তাদেরই একজন অধ্যাপক। এমন দৃশ্য আর কবে দেখেছে তারা! বিদ্যাপীঠ জায়গাটি এমনিতেই ললনাবিরল; প্রবীণ অধ্যাপকেরা সস্ত্রীক যখন অ্যাভেনিউতে বেড়ান, ছেলেরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেয়; তাঁদের কন্যারা একটু বড়ো হবার সঙ্গে-সঙ্গে পড়াশুনোর জন্য চালান হয় কলকাতায় (যদিও অন্যের মেয়ের জন্য পঞ্চমুখে শ্রীমতীর অনুমোদন করেন তাঁরা); আর শ্রীমতীর উঁচু দেয়ালের আশে-পাশে ঘোরাঘুরি ক'রেও কখনোই কিছু লাভ হয় না। তাদের মনে হ'লো, সারা জগতে ভাগ্যবান যদি কেউ থাকে সে-মানুষ অভিজিৎ মুখার্জি।

কিছুদিন পর থেকে এমন হ'তে লাগলো যে অভিজিৎ আর মালতী বেড়াতে বেরোলে প্রায়ই দেখা হ'য়ে যায় বেণীমাধব দাসের সঙ্গে। ভ্রমণের ভূগোল বদল করে তারা, কিন্তু এ-রকম ছোটো জায়গায় তার সুযোগই বা কতটুকু আছে, যেদিন যে-পথে যায় দৈবাৎ বেণীমাধবও সেটাই বেছে নিয়েছেন। তাঁর দু-একদিনের আলাপ (অভিজিতের মুখে যেমন শুনেছিলাম) এখানে উদ্ধৃত করি।

'এই যে অভিজিৎবাবু—ভালো?'

'আপনি ভালো তো?'

'ডাক্তার-সাহেবের খবর কী?'

'ভালোই।'

'মিসেস দে?'

'ভালো আছেন।'

'একটু আগে দেখলাম, প্রোফেসর গুপ্ত মিসেস দে-র সঙ্গে রেল-লাইনের দিকে গেলেন। আপনারা একসঙ্গে বেড়ান না?'

'তাও বেড়াই।'

'ইনি আপনার…বোন বুঝি?'

'না।'

'আত্মীয়?'

'তাও না। এঁর নাম মালতী ঘোষ, আর ইনি···'

'বেড়াতে এসেছেন এখানে?'

'ঠিক তা নয়। আমি শ্রীমতীতে পড়ি।'

'ও, পড়ো তুমি! এখানকার ছাত্রী! বাঃ!···তোমাকে "তুমি"ই ব'লে ফেললাম—মনে কিছু করলে না তো?'

'আচ্ছা—আবার দেখা হবে,' হনহন ক'রে এগিয়ে গেলো অভিজিৎ।

এর পরের সপ্তাহে আবার দেখা।

'তুমি প্রতি সপ্তাহেই আসো বুঝি? কোথায় থাকো?'

'কাকাবাবুর ওখানে।'

'কাকাবাবু?'

'মানে—ডাক্তার মুখার্জি।'

'ও। তিনি তোমার কাকা? তবে যে আপনি বললেন, অভিজিৎ-বাবু, যে ইনি আপনার আত্মীয় নন?'

'ডাক্তার মুখার্জি আমার বাবার বন্ধু।'

'বন্ধু? তা বেশ, বেশ। কোথায় থাকেন তিনি?'

'কলকাতায়।'

'ব্যারিস্টার?'

'আজ্ঞে?'

'তোমার বাবা ব্যারিস্টারি করেন?'

'না। চাকরি করেন।'

'সরকারি চাকরি?'

'হ্যাঁ।'

'কোন ডিপার্টমেণ্টে?

'আমি ঠিক জানি না।'

'চলো, মালতী, আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

'আচ্ছা।···অভিজিৎবাবু, আপনার বাবাকে বলবেন শিগগিরই আমি একদিন যাবো তাঁর কাছে।'

'কোনো অসুখ ··'

'না, না, অসুখ হবে কেন ··এমনি। অনেকদিন দেখা হয় না—ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে। উনি কিছু মনে করেননি তো?' (হয়তো না-বললেও চলে, অসুখ-বিসুখের দরকার ছাড়া বেণীমাধব এর আগে কখনোই মুখার্জিদের বাড়ি যাননি।)

আরেক দিন :

'এই যে, আমার ভাগ্য ভালো—প্রায়ই দেখা হ'য়ে যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে।···তা খোলা হাওয়ায় বেড়াতে বেশ লাগে··· স্বাস্থ্যকর। আর জায়গাটি বেশ প্লেজেণ্ট সত্যি।···কিন্তু, অভিজিৎবাবু, আপনার বিষয়ে একটা নালিশ আছে।'

'নালিশ?'

'আপনি আজকাল টিচার্স ক্লাবে একেবারেই আসছেন না?'

'কালও তো গিয়েছিলাম।'

'সে তো কলেজের সময়। সন্ধেবেলা আর যে দেখাই যায় না আপনাকে। উইক-এণ্ডেই থাকে কিনা নানা রকম। কাল একটা ছোটো ব্যাপার আছে—চা খাওয়া, একটু গান-বাজনা—আসবেন?'

'আসবো।'

অভিজিৎ এত সহজে রাজি হ'য়ে যাওয়াতে বেণীমাধব একটু নিরাশ হলেন, কিন্তু সে-ভাবটা সামলে নিয়ে তক্ষুনি আবার বললেন, 'অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনার ··বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করতে পারছি না। আমরা অবশ্য গেস্ট আনতে পারি, কিন্তু উনি এখানকারই ছাত্রী ব'লে···তা থাকগে, একবার যখন পরিচয় হ'লো তখন আরো জানাশোনা হবে নিশ্চয়ই। যাবো একদিন আপনাদের ওখানে।'

এর পরের শুক্রবারের সন্ধ্যায় বেণীমাধব সত্যিই এসে মুখার্জিদের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। বড়ো ড্রয়িংরুমটিতে বাড়ির সবাই একত্র হয়েছে তখন (সুবিধের জন্য নিজেকেও 'বাড়ির লোক' ব'লে ধরছি); একটা সোফায় মালতী আর প্রোফেসর গুপ্ত, আরেকটাকে অভিজিৎ, নাতালী আর আমি, ডাক্তার সাহেব ও তাঁর স্ত্রী আলাদা-আলাদা চেয়ারে। মেঝেতে আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় হারামণি। দরজার কাছে 'আসতে পারি ?' ব'লেই বেণীমাধব যেই ঢুকেছেন, হারামণি লাফিয়ে উঠে তাঁকে তাড়া করলে। ডাক্তার সাহেব ছুটে গিয়ে তাকে সামলালেন।

'হারামণি! অসভ্য হয়েছো! চুপ করো! শুয়ে থাকো চুপ ক'রে! ক্ষমা চাও!' ব'লে ডাক্তার ছোট্ট ক'রে তার কান ম'লে দিলেন। কিন্তু হারামণি এত অল্প শাসনে তার ঘেউ-ঘেউ থামালে না। অগত্যা নাতালী উঠে এসে তাকে সোফার পাশে নিয়ে বসলো, আমি অন্য আসনে উঠে গেলাম।

'আসুন, বেণীমাধববাবু, আসুন। হারামণিকে ভয় পাবেন না; ও দেখতে মস্ত হ'য়ে গেছে, কিন্তু বাচ্চা আছে এখনো—আদবকায়দা শেখেনি।' কুকুরের অভিঘাতে বেণীমাধব একটু ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিলেন, এইবার আত্মস্থতা ফিরে পেয়ে বললেন, 'কুকুর রাখলে তাকে আদবকায়দা শেখানো উচিত।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! তা দেখুন মানুষকে আদবকায়দা শেখাতে কত বছর কেটে যায়, সে-তুলনায় কুকুর তো চটপট শেখে। বসুন আপনি।'

তার বাবার কথা শুনে হঠাৎ লাল হলো অভিজিৎ। কিন্তু মুখার্জি দম্পতি নিখুঁত সৌজন্যে আপ্যায়ন করলেন বেণীমাধববাবুকে; রাত্রে তাঁকে আমাদের সঙ্গে খেয়ে যেতে হ'লো একেবারে। কুকুর-সংক্রান্ত ঘটনার জন্য তাঁরা লজ্জিত ছিলেন ব'লেই আপ্যায়নের ওজন আরো বেড়ে গেলো।

এখানে হারামণির ইতিহাসটা সংক্ষেপে ব'লে রাখি। কয়েকমাস আগে গুপ্ত-সাহেব একে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতা থেকে, নিউ মার্কেটের আশে-পাশে যারা কুকুর কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদেরই কাছে কেনা। এনে উপহার দেন নাতালীকে। তখন একেবারে কোলের বাচ্চা; কেঁউ-কেঁউ ক'রে খাবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়, আর যখন-তখন ঘর নোংরা করে। দেখতেও রূপবান নয়; গড়নটা ইঁদুরের মতো লম্বাটে, আর গায়ের রং কালচে ছাইমতো। কুকুরটার জাতগোত্রের কিছু ঠিক নেই, তাকে নৈকষ্য কুলীন নিশ্চয়ই বলা যায় না; কিন্তু ভালো খেয়ে-দেয়ে এক মাসের মধ্যেই বড়োসড়ো হ'য়ে উঠলো সে, আর গায়ের ছাই রং মিলিয়ে গিয়ে বাদামি আভা দেখা দিলো, রোদ পড়লে বালির মতো চিকচিক করে। সেই রঙের জন্য গুপ্ত-সাহেব তার নাম রাখলেন 'সাহারা', কিন্তু অন্যদের মুখে-মুখে তা ক্রমশ 'হারান' বা 'হারু' হয়ে উঠতে লাগলো, যা থেকে নাতালী বানিয়ে নিলে 'হারামণি'। নামত সে নাতালীর হ'লেও তার স্বত্ব বাড়ির সকলের মধ্যেই ভাগাভাগি হ'য়ে গেছে; মিসেস মুখার্জি তাকে খাওয়ান, ডাক্তার তার গায়ের পোকা বেছে দেন, প্রোফেসর গুপ্ত ভোরবেলা তাকে মাঠে দৌড় করিয়ে আনেন, আর নাতালী তাকে সারাদিন আদর দিয়ে নষ্ট করে। যখন ছোটো ছিলো নাতালীর বিছানাতেই ঘুমোতো রাত্রে, এখন বড়ো হ'য়ে তার খাটের পাশে মেঝেতে শুয়ে থাকে—বেশি রাত্রে কোথাও একটু শব্দ হ'লে ঘেউ-ঘেউ করে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

এতদিনে হারামণির এটুকু বুদ্ধি হয়েছে যে ঘরদোর আর নোংরা করে না, দাঁত দিয়ে ছেঁড়ে না সোফা অথবা বিছানার তোশক, ফুর্তির চোটে কখনো কিছু ভেঙে-টেঙে ফেললে অনুতপ্ত ভাব দেখাতেও শিখেছে। কিন্তু তাহ'লেও তার পশু-স্বভাব যাবে কোথায়—খাবার সময় মিসেস মুখার্জি আর নাতালী ছাড়া আর-কেউ কাছে দাঁড়ালে

সন্দেহ করে, প্রোফেসর গুপ্তকে ঘেঁাৎ ক'রে উঠেছিলো একদিন, আমাকে তো কামড়েই দিয়েছিলো, অভিজিৎকেও রেয়াৎ করেনি। ঘুমের মধ্যে আমরা কেউ আদর ক'রে তার গায়ে হাত দিলে অসভ্যের মতো হিংস্র দাঁত বের করে, পরমুহূর্তেই ল্যাজ নেড়ে ক্ষমা চাইলেও তার সেই দাঁত-বের-করা চেহারাটা ভাবতে ভালো লাগে না। (নাতালীর মতে এ-রকমই হওয়া উচিত, নয়তো আর কুকুর কিসের।) মাঝে-মাঝে কোনো আগন্তুককে তাড়া ক'রে অপ্রস্তুত ক'রে দিয়েছে বাড়ির লোকেদের—এই যেমন সেদিন বেণীমাধববাবুকে। বাড়ির কুকুরের দ্বারা এইরকম অভ্যর্থনা সকলে ঠিক ভালো চোখে ছাখে না; হয়তো সেইজন্যেই তিনি আমাদের সাপ্তাহান্তিক আড্ডাতে আর আসেননি।

কিংবা হয়তো সেজন্যে নয়। উনি প্রায় তিন ঘণ্টা ছিলেন আমাদের সঙ্গে, কিন্তু এতটা সময়ের মধ্যে নাতালী একটাও কথা বলেনি তাঁর সঙ্গে, আর মালতী যেটুকু বলেছে তা না-বলারই সামিল। সাধারণত মেয়েদেরই সামাজিক ট্যাক্ট বেশি থাকে, কিন্তু সেদিন নাতালী অন্তত প্রায় স্পষ্টই বুঝতে দিচ্ছিলো যে বেণীমাধব চ'লে গেলেই ভালো হয়। অবশ্য মিসেস মুখার্জি সুখাদ্যের দ্বারা বার-বার ভারাক্রান্ত ক'রে তুলছিলেন তাঁর প্লেটটি (আর সেগুলোর সদ্গতিও হচ্ছিলো); আর অভিজিৎ, তার বাবা ও আমি তিনজনে মিলে তাঁকে কথাবার্তায় ব্যাপৃত রাখার জন্য সম্ভবপর সব চেষ্টাই করছিলাম; কিন্তু বেণীমাববের চোখ বার-বার স'রে যাচ্ছিলো টেবিলের অন্য দিকটিতে, যেখানে দুই দিকে দুই তরুণীকে নিয়ে নবেন্দু গুপ্ত যেন আলাদা এক জগৎ রচনা করেছেন। আর এর পরে অবশ্য বেণীমাধবকে যুদ্ধঘোষণা করতে হ'লো।

এই ডিনার-পার্টির দিন দশেক পরে পুজোর ছুটি হ'য়ে গেলো; খুললো নবেম্বরের মাঝামাঝি। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (অভিজিতের কাছে ক্রমে-ক্রমে এ-সব শুনেছিলাম আমি) মিস্টার ঘোষ একখানা চিঠি পেলেন। মিস্টার ঘোষ মানে মালতীর বাবা। চিঠিখানা তিনি স্ত্রীকে দেখালেন না; পরের রোববার কয়েক ঘণ্টার জন্য মুক্তিগ্রামে এলেন। নিভৃতে কথা বললেন সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে, ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে, আর মালতীর সঙ্গে। তার দু দিন পর থেকে (ভগবান জানেন কী ক'রে সবাই সব কথা জেনে ফেলে এখানে) বিদ্যাপীঠের আলোচ্য হ'য়ে উঠলো মালতী ঘোষ।

চমৎকার কাগজে, চমৎকার টাইপ-করা ইংরেজিতে লেখা চিঠি, স্বাক্ষর ছিলো সুভদ্রা দেবীর।…'highly unsatisfactory conduct,' 'unless stricter vigilance is exercised ··it may be our painful duty…'এই ধরনের ভাষার প্রচুর ব্যবহার ছিলো। চিঠিখানা পকেট থেকে বের ক'রে মিস্টার ঘোষ জিগেস করলেন; 'আমার মেয়ের বিষয়ে এই চিঠি লিখেছেন আপনি। এর মানে কী?'

'আপনি এসে ভালো করলেন,' মাপা গলায় জবাব দিলেন সুভদ্রা দেবী। 'মালতী সম্প্রতি আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হ'য়ে পড়েছে।'

'দুশ্চিন্তার?'

'ডাক্তার মুখার্জি আপনার কী-রকম আত্মীয়?'

'আত্মীয় নন, বন্ধু।'

'ও, আত্মীয় নন?'

'আত্মীয় আর বন্ধুতে আমি তফাৎ করি না। অনেক সময় বন্ধুই বড়ো আত্মীয়।'

'এ-বিষয়ে আমাদের ধারণা অন্য রকম। ডাক্তার মুখার্জিকে মালতীর লোকাল গার্জিয়ান করা সমীচীন হয়েছে কিনা সে-কথা ভেবে দেখার সময় এসেছে।'

'এ-কথা কেন বলছেন?'

'অভিজিৎবাবু ডাক্তার মুখার্জিরই ছেলে না? আর অভিজিৎবাবু তো বিদ্যাপীঠে ইংরেজি পড়ান?'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি যে অভিজিৎবাবুর সঙ্গে মালতী যেভাবে মেলামেশা করছে, সেটা...অশোভন।'

'সত্যি তা-ই?'

'ওরা বিকেলবেলা একসঙ্গে বেড়ায়—সঙ্গে আর-কেউ থাকে না। অনেকেই দেখেছে।'

'ও। শুধু এই?'

'সাবধান না-হ'লে আরো কিছু হ'য়ে যেতে পারে। আপনার বন্ধু যদিও—খোলাখুলি বলছি—ডাক্তার মুখার্জির বাড়ির আবহাওয়াও খুব ভালো মনে হয় না আমার।

'কেন?'

'প্রোফেসর নবেন্দু গুপ্ত এখন আছেন ওখানে—খুব পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্য, কিন্তু তাঁর প্রভাব···বালক-বালিকাদের উপর তাঁর প্রভাব কী-রকম হবে তা নিয়েও চিন্তা করতে হচ্ছে আমাদের। আমি জানি, তিনি সকলের সামনে এমন কথাবার্তা বলেন, বা ব্যবহার করেন, যা অল্পবয়স্কদের পক্ষে সুদৃষ্টান্ত নয়।'

'আপনি জানেন? গেছেন সে-বাড়িতে?'

বরফের মতো গাম্ভীর্য নিয়ে সুভদ্রা দেবী জবাব দিলেন, 'সামাজিক দেখাশোনা ক'রে নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই, মিস্টার ঘোষ। আমার অনেক কাজ। সংক্ষেপে বলি: অভিজিৎবাবু শিক্ষক,

আপনার মেয়ে ছাত্রী। তাদের এ-রকম মেলামেশাটাকে আমরা অনুচিত মনে করি। সেটা মুক্তিগ্রামের আদর্শের বিরোধী। ছাত্র-শিক্ষকের পবিত্র সম্বন্ধ যদি কলুষিত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়, আমরা তা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখবো না।'

'কিন্তু আমার মেয়ে অভিজিতের ছাত্রী নয়—'

'কার্যত না হোক, আইনত তা-ই।'

'তাও যদি হয়, এর মধ্যে "কলুষ" আসছে কোত্থেকে?'

'যদি ব্যাপারটা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়?'

'ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের বিয়েতে কোনো বারণ আছে নাকি?'

'আইনত নেই, সামাজিক বাধাও নেই হয়তো, কিন্তু আমাদের আদর্শের দিক থেকে সেটা গুরুতর স্খলন। আমরা চাই সত্যিই ছাত্রজীবন, পবিত্র জীবন; এ-রকম যদি একটা ঘটনাও ঘটে তাহ'লে অন্যান্য হাট-বাজারের মতো স্কুল-কলেজের সঙ্গে আমাদের তফাৎ থাকলো কী? আমি জানি, মেয়েদের আজকাল সহজে বিয়ে হয় না, তাদের বিয়ে দেবার জন্য নানারকম উপায় অবলম্বন করতে হয় মা-বাবাদের—'

টকটকে লাল হ'য়ে উঠলেন মিস্টার ঘোষ। 'মাপ করবেন, সুভদ্রা দেবী, আমার মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রশ্ন; তা নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করবো না।'

'আচ্ছা, আপনার ব্যক্তিগত প্রশ্ন আপনারই থাক। মেয়ে যখন আপনার কাছে ফিরে যাবে তখন তার বিষয়ে আপনার অভিরুচি আপনি অনুসরণ করবেন, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু সে যতদিন এখানে আছে ততদিন এখানকার নিয়ম পালন ক'রে তাকে চলতেই হবে।'

'তার কোনো ব্যতিক্রম হয়েছে কি?'

'আমরা চাই না, সে আর ডাক্তার চ্যাটার্জির বাড়িতে আসা-

যাওয়া করে। তাতে তার ভালো হবে না। অভিজিৎবাবুরও ভালো হবে না। আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আমাকে এই মর্মে একটা চিঠি দিতে যে ডাক্তার চ্যাটার্জিকে যে-অথরিটি আপনি দিয়েছিলেন, তা প্রত্যাহরণ করছেন।'

'অর্থাৎ, মহীতোষ আর মালতীর লোকাল গার্ডিয়ান থাকবে না—এই আপনি চান?'

'ঠিক তা-ই।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

মিস্টার ঘোষ গাড়ি হাঁকিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে ডাক্তারের বাড়িতে পৌঁছলেন; সেখানে মালতীর সঙ্গে নিভৃতে কথা বললেন কিছুক্ষণ, তারপর চ্যাটার্জির সঙ্গে। এক ঘণ্টা পরে আবার রওনা হলেন কলকাতার দিকে। যাবার আগে সুভদ্রা দেবীকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেলেন। অত্যন্ত দুঃখিত যে তাঁর প্রস্তাবে তিনি রাজি হ'তে পারলেন না; 'আমি চাই মালতী পূর্বের মতোই ডাক্তার চ্যাটার্জির বাড়িতে উইক-এণ্ড কাটায়।'

সোমবার সকালের ক্লাশের পরে প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে চাইলো মালতী। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর প্রবেশের অনুমতি পেলো, আরো পাঁচ মিনিট পরে সুভদ্রা দেবী চোখ তুললেন।

'কী চাই?'

মালতী অভিবাদন ক'রে বললে, 'বাবা এই চিঠিখানা পাঠিয়েছেন আপনাকে।'

সুভদ্রা দেবী বন্ধ খামটা হাতে নিয়ে বললেন, 'চিঠিপত্র আপিশে দিয়ে যেতে হয়, জানো না?'

'আর-একটা কথা আছে।'

খাম খুলে চিঠিটার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন সুভদ্রা দেবী; বাঁ হাতে সরিয়ে রেখে বললেন, 'কী?'

'একটা কথা জিগেস করতে চাই আপনাকে। আমার ব্যবহারে কোথায়-কোথায় ত্রুটি হয়েছে, দয়া ক'রে যদি বলে দেন।'

'তোমার বাবা কিছু বলেছেন তোমাকে?'

'বলেছেন।'

'এই চিঠিতে তিনি কী লিখেছেন, তুমি জানো?'

'জানি।'

'ঠিক করেননি তোমার বাবা। এই চিঠিটা তোমার হাতে পাঠানো ঠিক হয়নি। এ-সব বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলাটা ভুল হয়েছে তাঁর।'

'ভুল? কিন্তু আমার বাবা কী করবেন বা না করবেন সে তো শুধু তাঁরই বিবেচনাসাপেক্ষ।'

'এ-ক্ষেত্রে নয়। এতে শ্রীমতীর সুনামের কথাও জড়িত।'

'কিন্তু ব্যাপারটা যখন আমাকে নিয়ে, আমার সঙ্গে কথা বলাই কি স্বাভাবিক নয়?'

'আসামির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিচারক তাকে শাস্তি দেন না।'

মালতীর চোখ ঝলসে উঠলো।—'আমি আসামি হলাম কেমন ক'রে? কী করেছি?'

'তুমি বিচারাধীন আছো।'

'বিচারাধীন?'

'যদি অপরাধ প্রমাণ হয়, শাস্তি পাবে। না হয় তো কিছু হবে না।'

'কিন্তু অভিযোগটা কী?'

'তা তোমাকে বলা যাবে না,' সুভদ্রা দেবী এমনভাবে একবার তাকালেন যাতে মালতীর অন্তস্তলে ভয় সেঁধিয়ে যায়।

'আমার বিচার হবে, আর অভিযোগটাও জানতে পারবো না আমি? আমি কি পড়াশুনোয় কোনো অবহেলা করেছি?'

'তাহ'লে তো এর চেয়ে ভালো ছিলো।'

'কোনো অবাধ্যতা করেছি কি কখনো ?'

'আমার এখন আর সময় নেই। দরকার হয় তো পরে ডেকে পাঠাবো তোমাকে।' সুভদ্রা দেবী টেবিলের দিকে চোখ নামালেন।

অপ্রস্তুতভাবে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মালতী চ'লে আসছিলো, হঠাৎ সুভদ্রা দেবী মুখ তুললেন। 'শোনো। একটা কথা। তুমি যে লিপস্টিক ব্যবহার করো সেটা আমরা পছন্দ করি না।'

'লিপস্টিক ?' মালতী প্রথমে যেন বুঝতে পারলে না কথাটা।

'Exactly. এখানে যদি পড়তে হয় কসমেটিক্স-এর সঙ্গে সংস্রব তোমাকে ছাড়তে হবে। কাল থেকেই। মনে থাকে যেন।'

'মাপ করবেন—ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝতে পারলে না ? *You must give up the use of cosmetics. Is that clear ?* এখানে এসেছো পড়াশুনো করতে—চেহারার উপর জালিয়াতি করার জন্য নয়। এখন যাও !'

মালতীর সারা মুখে আলপিন ফুটলো ; তার কুড়ি বছরের জীবনে এমন অপমানিত সে আর কখনো হয়নি।

আর সঙ্গে-সঙ্গে সারা বিদ্যাপীঠে ছড়িয়ে গেলো যে মালতী ঘোষকে খুব সম্ভব শ্রীমতী থেকে এক্সপেল করা হবে—যেহেতু তার চুল খাটো, সে লিপস্টিক মাখে, আর হাত-কাটা জামা প'রে ক্লাশে পর্যন্ত যায়।

ঐ লিপস্টিক ব্যাপারটা তখন আমাদের মধ্যে যে-উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলো তা আমি কখনো ভুলবো না। কিছুদিনের মতো কথাবার্তার অন্য সব বিষয় লুপ্ত হ'য়ে গেলো : মানুষের চাঁদে যাওয়া, হাঙ্গেরির বিপ্লব, ভারতের ভাষা-সমস্যা, কলকাতার নতুন ফিল্ম—সব ছাপিয়ে প্রধান হ'য়ে উঠলো লিপস্টিক। মেয়েরা যে ওষ্ঠাধরে বর্ণপ্রলেপ ক'রে থাকেন এটা একটা সুমহৎ নৈতিক প্রশ্নের আকার ধারণ করলে ; অভ্যেসটা যে মহাদোষের সেটা দিনের মধ্যে অন্তত দশ বার ক'রে

প্রমাণ হ'তে লাগলো নানা জায়গায়—শুধু দোষের নয়, রীতিমতো অপরাধ, পাপ বললেও নাকি অতিরঞ্জন হয় না। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, নীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস—নানা দিক থেকেই অসংখ্য যুক্তি উপস্থিত করা হ'লো। যে-সব মেয়েদের চুল খাটো, ঠোঁটে রং, আর জামার হাতা কাঁধের নিচে নামে না, তাদের মন স্পষ্টত তরলতার দিকে, চপলতার দিকে, পরগাছার মতো তারা—কী ভালো আমরা আশা করতে পারি তাদের কাছে, এই স্বাধীন ও নবীন ভারতে তাদের সার্থকতাই বা কী? শীতল ও রৌদ্রহীন দেশের কথা আলাদা, কিন্তু আমাদের এই গনগনে রোদের দেশে দেখতেও কদর্য, লাল ঠোঁটে রাক্ষসীর মতো দেখায়—'যেন রক্তপান ক'রে এসেছে এইমাত্র'—আর এই সিক্ত জলবায়ুতে জামার হাতা ছেঁটে ফেলা মানেই স্বেদক্ষরণের দুর্গন্ধ প্রচার করা। আর কত সময় নষ্ট, টাকা নষ্ট, ভেবে দেখুন। আর ওতে লাভই বা কী—ও-সব রাসায়নিকে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়, আরো তাড়াতাড়ি বার্ধক্যের রেখা পড়ে। তাছাড়া, য়োরোপীয়রাই এক জিনিশ, আর আমরাই আর; ভারতীয় নারীর ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা, সেখানে এ-সব কৃত্রিম প্রসাধনের স্থান নেই।

উত্তরে বলা যেতো যে, কালিদাস ও বাৎস্যায়ন যদি সত্য ব'লে থাকেন, তাহ'লে প্রাচীন ভারতেও মেয়েদের মধ্যে 'কৃত্রিম প্রসাধনে'র বিরাট চর্চা ছিলো, অতএব তাকে 'অভারতীয়' বা 'ঐতিহ্যবিরোধী' কেমন ক'রে বলা যায়? আধুনিক যুগেও মেয়েরা (এমনকি পুরুষরাও) তাম্বুলচর্বণ ক'রে ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ করেন, এই রৌদ্রময় দেশে সেটা সহ্য হ'লে অন্যটা হবে না কেন? বরং লিপস্টিকে শুধু ঠোঁটই লাল হয়, পানের রসে দাঁত সুদ্ধ রঞ্জিত হ'য়ে সৌন্দর্যহানি ঘটায়। আর সময় যদি বাঁচাতে চান, পরিচ্ছন্নতা যদি লক্ষ্য হয়, তাহ'লে তো ছাঁটা চুলের অনুমোদন না-ক'রে উপায় থাকে না। লম্বা চুল বাঁধতে, খুলতে, পরিষ্কার রাখতে, যতটা সময় 'নষ্ট' হয়, তার চেয়ে

অনেক, অনেক কম সময়ে ঠোঁটের উপর একটা কাঠি বুলিয়ে নেয়া যায় নাকি? হাত-কাটা জামা পরলেই তরলতার দিকে মন যাবে তা-ই বা কেমন ক'রে বলা যায়, কেননা এমনও তো উদাহরণ আছে যে ঐ ধরনের বেশবতী মহিলারা 'স্বাধীন ও নবীন ভারতে'র মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আর টাকা—টাকা তো কত ভাবেই 'নষ্ট' হচ্ছে: ভালো শাড়ি, গয়না, সিগারেট, আতিথেয়তা, পূজা-পার্বণ, ছুটিতে বেড়ানো, শৌখিন বই কেনা—মানুষ তো আর পশু নয় যে কোনোরকমে পেটটি পুরলেই হ'য়ে গেলো, তার জীবনে কিছু-না-কিছু বাহুল্য আছেই—এমনকি ঐ বাহুল্যেই তার মনুষ্যত্ব।

আরো অনেক কথা বলা যেতো, কেউ-কেউ সে রকম চেষ্টা করেননি তাও নয়, কিন্তু বিরুদ্ধ তরঙ্গের মুখে তাঁদের কথা কুটোর মতো ভেসে গেছে। মুক্তিগ্রামের 'প্রমাণিত সত্যে'র মধ্যে একটি এই দাঁড়িয়ে গেলো যে লিপস্টিকের ব্যবহার অতি গর্হিত কর্ম—বলতে গলে চরিত্রহীনতার নামান্তর; শ্রীমতীর 'পবিত্র প্রাঙ্গণ' থেকে অভ্যাসটাকে উচ্ছিন্ন করা অত্যাবশ্যক।

আশ্চর্য এই যে এতখানি তোলপাড়ও মালতী ঘোষকে বিচলিত করতে পারলে না। শ্রীমতীর আর যে-সব মেয়েরা লিপস্টিক মাখতো, (সংখ্যায় তারা নগণ্য, আর বেশির ভাগই অবাঙালি) তারা, মালতী তিরস্কৃত হবার পরদিনই ঐ 'কৃত্রিম প্রসাধন'গুলোকে বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে ফেললে (প্রসাধনমাত্রেই কৃত্রিম, সেইজন্য উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার করতে হচ্ছে), তিন দিনের মধ্যে তাদের ঠোঁট থেকে সেই 'পাপের স্মৃতিচিহ্ন' দূর হ'য়ে গেলো, আর পরের সপ্তাহ থেকে তাদের জামার হাতা নেমে এলো প্রায় সুভদ্রা দেবীর মতোই কনুই পর্যন্ত—কেউ-কেউ নাকি বাড়িতে এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম ক'রে সেগুলি পার্সেলে আনিয়ে নিয়েছিলো কলকাতা বা টাটানগর বা বানারস থেকে। কোনো পরিবর্তন দেখা গেলো না শুধু মালতীর। শুক্রবার থেকে রবিবার

পর্যন্ত সে তেমনি কাটাচ্ছে মুখার্জিদের বাড়িতে, তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে অভিজিতের সঙ্গে—হাত কাটা জামায়, ছাঁটা চুলে, সুশ্রী চেহারা আর টুকটুকে লাল ঠোঁট নিয়ে। সবাই স্তম্ভিত হ'লো যে ঐটুকু মেয়ের এত সাহস কী ক'রে হয়। ধ'রে নিলে যে তার এই আস্পর্ধার পিছনে আছে তার 'তথাকথিত অভিভাবকদের' জোর; ডাক্তার মুখার্জি আর নবেন্দু গুপ্তর কারসাজি, প্রিন্সিপালকে সহায় পেয়ে বড়ো বেশি তড়পানি হয়েছে এঁদের—ভাবছেন যে সুভদ্রা দেবী আর মজুমদার মশাইকে লঙ্ঘন ক'রে টিকে থাকা যায় এখানে—কিন্তু সে-ভুল ভাঙলো ব'লে! 'তথাকথিত অভিভাবকদের' বিষয়ে এই অনুমানটিকে ভিত্তিহীন অবশ্য বলা যায় না, কেননা নবেন্দু গুপ্ত বেশ খোলাখুলি-ভাবেই সহাস্যে বলেছিলেন: 'লিপস্টিক মাখা বারণ! এর পরে বোধহয় আমিষভোজন বারণ হবে? আর তারপরে নিয়ম হবে যে বিশুদ্ধ ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় মতে ছাড়া কেউ কোনো চিকিৎসা করাতে পারবে না?'—হ্যাঁ, ও-রকম বলেছিলেন তিনি, কিন্তু মালতী যে শুধু তাঁর ভরসাতেই এতদূর এগিয়েছিলো সেটাও আমি মানতে পারি না, জোর তার নিজেরই মধ্যে ছিলো—আমি জানি। ঐ 'চেহারার উপর জালিয়াতি' কথাটা বড্ড বিঁধেছিলো তাকে; যৌবনের একগুঁয়েমিবশত সে দেখেছিলো তার উপর অন্যায় করা হচ্ছে, তাকে একজন সাবালকের মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না, আর উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে কারো-কারো কাছে সবচেয়ে কাম্য মনে হয় এই মর্যাদা, তার জন্য অনেক অসুবিধে ভোগ করতেও ভালো লাগে। হয়তো মালতী ভুল করেছিলো, হয়তো তার সুভদ্রা দেবীর কথাটা মেনে নেয়াই উচিত ছিলো—আর সত্যি, শেষ পর্যন্ত, কী বা এসে যায় লিপস্টিক মাখলে বা না-মাখলে। কিন্তু ঐ এক জেদ তার—'আমাকে ও-রকম ক'রে বলা হবে কেন, উনি প্রিন্সিপাল হ'তে পারেন, সবই হ'তে পারেন, তাই ব'লে আমাকে অপমান করতে

পারেন না! লিপস্টিকের জন্য আধ পয়সাও কেয়ার করি না আমি, এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু আমাকে ছেলেমানুষের মতো ভয় দেখিয়ে ছাড়ানো হবে তাতে আমি রাজি নই!'—এটা বিদ্রোহের সুর, এটাকে ভালো বলা যায় না, মালতীর পক্ষে সুবুদ্ধির কাজ হ'তো শ্রীমতী ছেড়ে দেয়া, কিন্তু 'কেন, ছাড়বো কেন?' সে বলেছে, 'আমি কি কোনো দোষ করেছি যে পালিয়ে যাবো?'

সবচেয়ে খারাপ যেটা হ'লো সেটা এই যে বিদ্যাপীঠের একজন ছাত্রী সুভদ্রা দেবীর আদেশ অমান্য ক'রেও শ্রীমতীর ছাত্রী হিশেবে থেকে গেলো। 'আদেশ' না-ব'লে বোধ হয় 'উপদেশ' বলা উচিত, কিংবা 'পরামর্শ'; কেননা, ভেবে দেখতে গেলে, 'কাল থেকে তুমি আর নীল রঙের জামা পরবে না', এটাকে যেমন একটা 'আদেশ' ব'লে গণ্য করা সম্ভব নয়, তেমনি কসমেটিক্স বিষয়ে সুভদ্রা দেবীর ঘোষণাকেও। তবু, সুভদ্রা দেবী ঘুণাক্ষরেও যে-ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সেটা পালিত না-হওয়া—বাইরের লোকেরা ধারণা করতেও পারবেন না মুক্তিগ্রামের পক্ষে এই ঘটনাটি কত ভীষণ। 'গেলো—আমাদের ঐতিহ্য গেলো—আদর্শ গেলো!' এই কথাটি কতবার যে শুনেছি। 'মেয়েটাকে এক্ষুনি তাড়িয়ে দেয়া উচিত', সে-বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ নেই, কিন্তু কী ওজুহাতে তাড়ানো যায় এইটেই সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ালো।

অবশেষে—মাসখানেক কেটে গেছে ইতিমধ্যে—সেক্রেটারির ঘরে একদিন ডাক পড়লো মালতীর। কাচে-ঢাকা মস্ত টেবিলের পিছন থেকে তিনি তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। কথা আরম্ভ করলেন ঠিক সেইভাবে, যে-ভাবে আদালতে সাক্ষীকে জেরা করে উকিল।

'তোমার নাম মালতী ঘোষ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাবার নাম মণিলাল ঘোষ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি—শ্রীমতীতে—সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ো?'

'সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি।'

'এ-কথা কি ঠিক যে কিছুদিন আগে তোমাদের প্রিন্সিপাল তোমাকে কোনো নির্দেশ দিয়েছিলেন?'

'কোন বিষয়ে?'

'তোমার কনডাক্টে কোনো ত্রুটি বিষয়ে?'

'আমার "unsatisfactory conduct"-এর উল্লেখ ক'রে আমার বাবাকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। আমি তাঁর কাছে জানতে গিয়েছিলাম আমি কী দোষ করেছি?'

'তুমি বলতে চাও তুমি না-জেনে দোষ করেছিলে?'

'না। তা বলতে চাই না। দোষ করলে জেনে-শুনেই করতাম। আমি বলতে চাই আমি কোনো দোষ করিনি।'

'প্রিন্সিপালের কোনো নির্দেশ অমান্য করোনি তুমি?'

'তিনি আমাকে বলেছিলেন কসমেটিক্স ব্যবহার না-করতে। কিন্তু সে তো সেই চিঠি লেখার পরে। আমি এখনো জানতে পারিনি আমি কী দোষ করেছিলাম যাতে বাবার কাছে ও-রকম কথা লিখতে হ'লো।'

'সে-কথা সুভদ্রা দেবী তোমার বাবাকে বলেছেন। কিন্তু তাঁর কথা তুমি কী-রকম মান্য করছো তা তোমার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছি।'

'আপনার কথার অর্থ কী, আমি জানি না, স্যর।'

'জানো না? বিদ্যাপীঠের ছাত্রীদের কসমেটিক্স ব্যবহার করা বারণ, এই কথাটা বোঝা কি এতই শক্ত।'

'শুধু ছাত্রীদের, না টীচারদেরও?'

'টীচারদেরও। এটা স্কুল, শিক্ষায়তন; ভোগবিলাসের জায়গা নয়।' কথার উত্তর দিতে গিয়ে মালতী হঠাৎ হেঁচে ফেললো। ঘরটি

এয়ার-কণ্ডিশণ্ড, বাইরে জানুয়ারির শীত, টেবিলের উপর মোটা কাচ—যার উপর সে একটি হাত রেখেছে—সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা। মজুমদার মশাইর পরনে ছিলো ভারি পশমি স্যুট, কাশ্মীরি পুল-ওভার, তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ উষ্ণ আরামে আছেন। কিন্তু মালতীর গায়ে গরম কাপড় ছিলো না—ঘরের মধ্যে এতটা ঠাণ্ডা হবে তা সে বুঝতে পারেনি, ভিতরে-ভিতরে শীত করছিলো তার। হাঁচির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে সে বললে, 'কিন্তু শ্রীমতীতে এ-রকম কোনো নিয়ম আছে কি?'

'নিয়ম? ইউ মীন রেগুলেশন? এটা আইনের কথা নয়, এটা আমাদের এখানকার কনভেনশন।'

'কিন্তু আমি ছাড়াও অনেক মেয়ে ও-সব ব্যবহার করে। টীচারদের মধ্যেও কেউ-কেউ—'

'আর করবে না। সবাই বন্ধ করেছে। এক তুমি ছাড়া।'

'কিন্তু তাহ'লে এটাকে কনভেনশন বলা যায় কী ক'রে? কনভেনশন কি তাকেই বলে না যা বহুদিন ধ'রে প্রচলিত হ'য়ে আসছে?'

কালো হ'য়ে গেলো সেক্রেটারির মুখ। চাপা গলায় বললেন, 'বেশ! রেগুলেশন ব'লেই ধ'রে নাও। সাতদিনের মধ্যে নোটিস পাবে সবাই। হ'লো?'

'কিন্তু, স্যর, একটা কথা জানবার আছে। "কসমেটিক্স" বলতে ঠিক কী বোঝায়? স্নো, ক্রীম, পাউডর—এগুলোও কি তার মধ্যে ধরা হবে?'

'পরিচ্ছন্নতার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু চলবে। বাবুগিরি চলবে না।'

'কিন্তু আমরা বুঝবো কী ক'রে কোনটা বাবুগিরি আর কোনটা পরিচ্ছন্নতা? পাউডর না মাখে এমন মেয়ে প্রায় কেউই নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার জন্য সেটা কি অপরিহার্য?'

আরেক পোঁচ কালো হ'য়ে সেক্রেটারি বললেন, 'নোটিস পেলে সবই বুঝবে। এখন যাও।'

সেদিন বাড়ি ফিরতে দেরি হ'লো মজুমদার মশায়ের। কেরানিকে ডেকে দুটো কমিটির এমার্জেন্সি-মীটিঙের নোটিস লেখালেন, তারপর বসলেন তাঁর একটি অতি প্রিয় কাজ নিয়ে। নতুন একটা রেগুলেশন ড্রাফট করতে হবে।

এই কাজে ওস্তাদ তিনি, কিন্তু সেদিন তা সহজ হ'লো না। 'That no student of Shrimati—' শুধু ছাত্রী কেন, টীচারদের কথাও বলতে হবে—'That no student or teacher of Shrimati—' কেরানিরা?—মাথা চুলকে আবার লিখলেন, 'That no person officially connected with Shrimati, whether a student or a member of the faculty or administration—' কিন্তু 'person' কথাটা ঠিক হ'লো কি? 'Person' বলতে পুরুষও বোঝায়, আর যদিও শ্রীমতীতে দরোয়ান বেয়ারা ইত্যাদি ছাড়া আর-কোনো পুরুষ-কর্মী নেই, তবু আইনত তাদেরও তো ধরতে হবে। এমনভাবে লেখা চাই যাতে শুধু মেয়েদেরই বোঝায়। 'The authorities of Shrimati wish it to be clearly understood that no student or incumbent of the institution—' নাঃ, ভালো শোনাচ্ছে না।

মজুমদার মশাই কফি আনালেন, ডিক্‌শনারি আনালেন, এ-পর্যন্ত ছাপা-হওয়া শ্রীমতীর পুঁথিপত্র সব আনালেন, একটি ছোকরা কেরানিকে আটকে রাখলেন ছুটির পরে;—প্রায় দু-ঘণ্টা কসরতের পরে যেটা দাঁড় করালেন সেটা মোটামুটি এইরকম:

'That no student or teacher of Shrimati, or member of its administrative staff, shall use, during school or office hours, or within the campus area, or

while in residence at Muktigram, any salve, lotion, unguent or ointment (e. g., rouge, lipstick, eyebrow-pencil, etc.) which falls under the category of "luxury" or "decorative appendage" and is not strictly necessary for maintaining personal cleanliness.'

পর-পর হুটো কমিটিতে পাশ করিয়ে নিয়ে সেক্রেটারি এটা পাঠিয়ে দিলেন প্রেসিডেণ্টের কাছে। প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে যখন ফেরৎ এলো, শোনা যায় কাগজটার উপরে লাল পেন্সিলে লেখা ছিলো 'Absurd'। অথচ তাঁর সম্মতি ভিন্ন মুক্তিগ্রামে কিছুই স্থির হ'তে পারে না। সেক্রেটারি একটি নতুন ভিজিলান্স কমিটি গঠন করলেন; একটা কুড়ি বছরের মেয়েকে তাড়াবার জন্য আশ্চর্য সব আইনের বুদ্ধি খেলতে লাগলো তাঁর মাথায়। ইতিমধ্যে প্রায় আরো হু-মাস কেটে গেলো; মুখার্জির বাড়িতে তেমনি চলতে লাগলো আমাদের সান্ধ্য বৈঠক। অভিজিৎ আর মালতী পরস্পরকে 'তুমি' বলছে এখন; আগের চাইতে কিছু বেশি নিরিবিলিতে থাকতে চায় তারা; ছুটিতে মালতীর কলকাতার বাড়িতেও অভিজিৎ দেখা করে মাঝে-মাঝে।

কিছুদিনের জন্য মনে হয়েছিলো যে ব্যাপারটা বুঝি চাপা প'ড়ে গেলো, কেননা মানুষ যেমনই হোক, তার একটি মস্ত গুণ এই যে একই বিষয়ে বেশিদিন সে তার মনকে নিবিষ্ট রাখতে পারে না। কিন্তু দৈবাৎ এমন একটি ঘটনা ঘটলো যাতে এই বিশ্রী আখ্যানটাকে যেন চুলে ধ'রে টেনে নেয়া হ'লো সমাপ্তির দিকে।

ইংরেজি বিভাগের দ্বিতীয় অধ্যাপক গোবিন্দবাবুকে আশা করি পাঠকের মনে আছে। তাঁর বিবাহিতা কন্যা কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়িতে এসেছিলেন, সঙ্গে বছরখানেকের একটি পুত্রসন্তান। এই শিশুটির কী একটু অসুখ করাতে ডাক্তার মুখার্জি তাকে দেখতে যান; দেখে তাঁর এত ভালো লাগে যে দু-দিন পরে কল্ সেরে ফেরার পথে তাকে গাড়িতে বসিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন।

শিশুটি দেখতে-দেখতে মুখার্জি-বাড়ির একটি প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠলো। নাতালী আর মুখার্জি-দম্পতি তাকে সোনাতোলা করেন, গুপ্ত-সাহেব তার সাড়া পেলে উঠে আসেন বই বন্ধ ক'রে, অভিজিৎ আর আমি যে নেহাৎই অবিবাহিত যুবক, আমরাও মাঝে-মাঝে তার দিকে দৃষ্টিপাত না-ক'রে পারি না। সুস্থ, পুষ্ট ছেলে; এই পৃথিবীতে আসতে পেরেছে ব'লে ভারি খুশি; চেনা হোক, অচেনা হোক, চোখে চোখ পড়লেই এক গাল হেসে ফেলে; যা-কিছু হাতে দেয়া যাক একটুও অভিমান না-ক'রে তক্ষুনি খেয়ে নেয়: কোলে নিতে চাইলে আপত্তি করে না, বসিয়ে দিলে ব'সেই থাকে, আর জ্বলজ্বলে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে অবিরাম কৌতূহল প্রকাশ করে। এমন শিশুকে কার না ভালো লাগে? ছোট্ট শাদা দুটো সামনের দাঁত উঠেছে, থপথপ ক'রে হাঁটতে শিখেছে, 'ভোম্বল' ব'লে ডাকলে তক্ষুনি 'দা—ই' ব'লে সাড়া দেয়। মিসেস মুখার্জি প্রায়ই তাকে আনিয়ে নেন নিজের কাছে, সঙ্গে কখনো-কখনো তার মা-ও আসেন, কিন্তু সব সময় আসেন না— কিন্তু মা-কে ছেড়ে তিন ঘণ্টা থাকলেও একবার সে কাঁদে না বা ঘ্যান-ঘ্যান করে না। একেবারে সদানন্দ! সে এলে আমাদের দিকে নাতালীর বা মিসেস মুখার্জির মনোযোগ অনেক ক'মে যায়।

একদিন আমরা সবাই মিলে গল্প করছি, ভোম্বলও আছে, কিন্তু কেউ লক্ষ করেনি কখন সে নাতালীর কোল থেকে নেমে, কিছুটা হেঁটে কিছুটা হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দার দিকে চলেছে। হঠাৎ হারামণির গর্জনে আর ভোম্বলের কান্নায় আমরা ছুটে বেরিয়ে এলাম। এসে দেখি, মিসেস মুখার্জি উপুড় হ'য়ে পড়েছেন মেঝের উপর, তাঁর বুকের তলায় হারামণি গোঁ-গোঁ করছে, এদিকে হাত বাড়িয়ে ভোম্বলকে শক্ত ক'রে ধ'রে আছেন তিনি। একটু দূরে হারামণির খাবারের থালা।

দৃশ্যটি দেখামাত্র ব্যাপারটা আমরা সবাই বুঝে ফেললাম। খাচ্ছিলো হারামণি, হঠাৎ কাছাকাছি ভোম্বলকে দেখে রুখে উঠেছে। অবশ্য ভোম্বলের সঙ্গে অনেক আগেই হারামণির ভাব করিয়ে দেয়া হয়েছিলো, দু-জনে খেলাও করেছে কখনো-কখনো, কিন্তু খাবার সময় হারামণির মাথার ঠিক থাকে না।

ডাক্তার মুখার্জি ভোম্বলকে কোলে তুলে নিলেন। দেখা গেলো, তার দু-জায়গায় রক্ত বেরোচ্ছে, দাঁতের দাগ কাছে এলেই বোঝা যায়। আমরা সবাই ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলাম, কিন্তু ডাক্তার বললেন— 'ও কিছু না, কিছু হবে না।' ব'লে ডেটল মিশিয়ে ধুয়ে দিলেন জায়গা দুটো, মোলায়েম একটা মলম লাগিয়ে দিলেন। কোলে নাচিয়ে, শিস দিয়ে তাকে শান্ত করলেন, খানিক পরে যখন ঘুমিয়ে পড়লো নিজে গিয়ে তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এলেন বাড়িতে। রাত দশটায় আবার তাকে দেখতে গেলেন, পরের দিন সকালে অন্য কাজ শুরু করবার আগে প্রথমেই গেলেন গোবিন্দবাবুর বাড়িতে। বেশি রাত্রে ভোম্বলের একটু জ্বর হয়েছিলো, মলিন হ'য়ে আছে—তা হবে না, অত বড়ো একটা ভয় পেয়েছে! কিন্তু ভয়ের কিছু নেই।

বেলা দেড়টায় বাড়ি ফিরে ডাক্তার দ্যাখেন, আপিশ-ঘরে অপেক্ষা ক'রে আছেন বেণীমাধব।

'কী খবর, বেণীমাধববাবু? কারো অসুখ?'

'আজ্ঞে না। আমি গোবিন্দবাবুর কাছ থেকে আসছি।'

'আমি তো এক্ষুনি এলাম তাঁর বাড়ি থেকে।'

'তা ওঁর নাতিটির বিষয়ে—'

'আমি এইমাত্র আরেকবার তাকে দেখে এলাম।'

'জ্বর কী-রকম?'

'জ্বর আছে একটু—তা সেরে যাবে।'

'কোনো ওষুধপত্র দিয়েছেন?'

বেণীমাধবের কথার ধরনে ডাক্তার মুখার্জি একটু অবাক হ'লেন। সংক্ষেপে বললেন, 'ওষুধ লাগবে না।'

'গোবিন্দবাবুরা ভয় পেয়েছেন কিন্তু। যদি খারাপ কিছু দাঁড়ায়?'

'ভয়ের কিছু নেই। আমি বুঝিয়ে বলেছি ওঁদের।'

'কুকুরে কামড়েছে—ব্যাপারটি তো সোজা নয়। যদি জলাতঙ্কে দাঁড়ায়?'

ডাক্তার মুখার্জি হেসে বললেন, 'না, না, সে-ভয় নেই। হারামণি চমৎকার সুস্থ কুকুর—ও-সব হবে কী ক'রে?'

'কী ক'রে জানেন, সুস্থ?'

'বাঃ, আমার বাড়ির কুকুর আর আমি জানি না! আর পাগলা কুকুর দেখলেই চেনা যায়।'

গোবিন্দবাবু বললেন, 'কামড়াবার দশ দিন পরেও পাগল হ'য়ে যেতে পারে?'

'আমার কাছেই শুনেছেন কথাটা, কিন্তু ভুল বুঝেছেন। পাগলা কুকুর যদি কাউকে কামড়ায়, তাহ'লে তার পরে দশদিনের মধ্যে সে নিজেই ম'রে যাবে। কামড়ানোটা তার অসুখেরই সিমটম।'

'তাহ'লে তো কুকুরে কামড়ানো মাত্রই জলাতঙ্কের প্রতিষেধক নেয়া উচিত।'

'যদি রাস্তার কুকুর হয়—নিশ্চয়ই। কিন্তু বাড়ির কুকুর হ'লে তার কিছু দরকার নেই—শুধু কুকুরটিকে একটু নজরে রাখা দরকার। কুকুর যদি ভালো থাকে, যদি দশ দিনের মধ্যেও তার কিছু না হয়—তাহ'লে নিশ্চিন্ত।'

'কিন্তু দশ দিনের মধ্যে কুকুরের যদি কিছু হয়, তাহ'লে কি রোগীর পক্ষে বড্ড দেরি হ'য়ে যাবে না?'

'না। হবে না। তখন চিকিৎসা করার প্রচুর সময় থাকবে।'

'ঠিক জানেন?'

'আমি ডাক্তার,' মুখার্জি গম্ভীর হলেন।

'সে তো বটেই, সে তো বটেই,' ঘাড় নেড়ে হাসলেন বেণীমাধব। 'আপনি বলছেন, এর উপরে আর কথা কী। কিন্তু কী জানেন—গোবিন্দবাবুরা বড্ড ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। এই প্রথম নাতি ওঁদের—আর বোঝেন তো, মায়ের প্রাণ।'

'কই, ওঁরা তো আমার কাছে কিছু ব্যস্ততা প্রকাশ করলেন না। আমি সবই বুঝিয়ে বলেছি ওঁদের—এই তো এ-বেলাই অনেক ভালো আছে ভোম্বল। কাল আর জ্বর থাকবে না।'

'আপনার কাছে বলতে ওঁরা সংকোচ বোধ করেন।'

'বাঃ, ডাক্তারের কাছে সংকোচ, আর আপনাকে সব বলেছেন?'

'আপনার বাড়িরই কুকুর কিনা, সেইজন্যে—'

'তাতে কী? আমার বাড়ির কুকুরে যা হয়েছে, আপনার বাড়ির কুকুর হ'লেও আমি ঠিক সেই বিধানই দিতাম, বেণীমাধববাবু। হারামণি বাড়ির অনেককেও কামড়ে দিয়েছে এর আগে—আমার ছেলেকে কামড়েছে, তাপসকে কামড়েছে, আর চাকরদেরও—কিন্তু কারোরই কিছু হয়নি এ-পর্যন্ত। অতএব ভয় কিসের।'

'ওর একটু কামড়াবার অভ্যেস আছে তাহ'লে?' বেণীমাধব হাসলেন। 'তা আমিও ওর দাঁতের স্পর্শ প্রায় পেয়েছিলাম একদিন।'

'নির্বোধ পশু, ক্ষমা করবেন ওকে,' ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বেরিয়ে আসতে-আসতে বেণীমাধব আবার বললেন, 'তাহ'লে আপনি বলছেন আর কিছু দরকার নেই ?'

'কিচ্ছু না।'

'আর কাউকে কনসাল্ট করতে চান যদি—'

এ-কথার উত্তরে ডাক্তার ধীরে-ধীরে বললেন, 'আমার পঁচিশ বছরের প্র্যাকটিস হ'লো, বেণীমাধববাবু। এ-বিষয়ে আর-কিছু বলবার থাকলে গোবিন্দবাবুকেই বলবো।'

বেণীমাধব চোখ নামিয়ে নিয়ে দ্রুত একটা নমস্কার সেরে বিদায় নিলেন।

আমার অভিজ্ঞতায় যেটা মুক্তিগ্রামের সবচেয়ে অদ্ভুত কানাঘুষো, সেটা এই সময়ে গজিয়ে উঠলো। সবচেয়ে অদ্ভুত এইজন্য যে তার উপলক্ষ কোনো মানুষ পর্যন্ত নয়—একটা বাক্‌শক্তিরহিত কুকুর মাত্র। পাকে-প্রকারে সকলেই জেনে গেলো যে মুখার্জিদের বাড়িতে যে-চতুষ্পদটি লালিত হচ্ছে, সে চেহারায় কুকুর হ'লেও আসলে 'শয়তানের বাচ্চা'। আর এই পিশুন জন্তুকে যারা বিছানায় নিয়ে শোয়, কান চুলকে দেয়, কোলে মাথা টেনে সোফাতে পাশে এনে বসায়, তারাই বা কী-রকম ভদ্রলোক, বলুন তো! আরে বোঝেন না, ওটা হ'লো ওঁদের আভিজাত্য—ওঁরা কত কালচার্ড, কত উঁচু দরের মানুষ, তারই বিজ্ঞাপন—অভ্যাগতকে মোড়ায় বসিয়ে কুকুরকে বসানো হয় গদি-আঁটা চেয়ারে—যার মানে হচ্ছে, 'আপনাদের আমরা কুকুরের চেয়েও অধম জ্ঞান করি।'—এ আর কে না বোঝে! সুবিধে বুঝে জন্তুটিকে লেলিয়েও দেয়া হয় মাঝে-মাঝে; এই তো তাপসবাবু ভালোমানুষ, রোজ যান ও-বাড়িতে, তাঁকেও চারদিন কামড়েছে—আর বেণীমাধব-বাবুর একদিন কী হয়েছিলো জানেন না? তিনি দরজার কাছে আসা

মাত্র শয়তানটা লাফিয়ে পড়লো তাঁর উপর, জামা ছিঁড়ে দিলে, নখ বসিয়ে দিলে গায়ে, আর সেই মনোরম দৃশ্যে পুলকিত হ'য়ে গুপ্ত-সাহেব হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, মুখ টিপে অন্য দিকে তাকালেন মালতী ঘোষ আর নাতালী দে। যথাযোগ্য মিলেছেও সব এক জায়গায়। মনে আছে তো মিসেস দে-র সেই ব্যাপার? বোশেখ মাসের রোদ্দুরে ঘুরে-ঘুরে সাত পাড়ার নেড়ি কুত্তাকে ভোজ খাওয়ানো! কী মহানুভবতা! কী আশ্চর্য খৃষ্টান করুণা! যে-দেশে লক্ষ মানুষ না-খেয়ে মরছে সেখানে কুকুরকে প্রেম না-করলে মানুষকে অপমান করা যাবে কেমন ক'রে! —আর শেষ পর্যন্ত কিনা একটা শিশুকে এই শাস্তি দেয়া হ'লো। ঝিকে ঠেঙিয়ে বৌকে শেখানো। সেই যে মীটিঙে তর্ক করেছিলেন গোবিন্দবাবু সেটা কি আর গুপ্ত-সাহেব ভুলতে পেরেছিলেন। দেখুন মশাই, কোথাকার জল কতদূর গড়ায়! আর আমাদের ডাক্তার মুখার্জি—

ডাক্তার মুখার্জির নাম ওঠামাত্র কণ্ঠস্বর আরো নিচু হয় সকলের, কাছাকাছি স'রে বসেন বক্তারা, কিংবা (যদি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা হয়) ইনি ওঁর জামার হাতা ধ'রে টান দেন। এই অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতার কারণ, যার দ্বারা উপকৃত হয়েছি তার নিন্দায় এমন একটি বিশেষ সুখ আছে, যার প্রভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐক্যবোধ তৎক্ষণাৎ বিপুলভাবে বেড়ে যায়। অনেক নীতিবিদ নিন্দুকের নির্জলা নিন্দা ক'রে থাকেন, কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি এই মতটি কিছু একপেশে—এর অন্য একটা দিকও আছে। যদি কারো কোনো প্রশংসার কথা ওঠে আর ঘরে পাঁচজন লোক উপস্থিত থাকে, তাহ'লে—নিঃসন্দেহে বলা যায়—পাঁচজন পাঁচ রকম কথা বলবেন, একজন করবেন প্রশংসা, আর চারজন চারটি ভিন্ন-ভিন্ন দিক থেকে প্রতিবাদ করবেন সে-কথার। অর্থাৎ, সংহতি নামক মহৎ গুণটি নষ্ট হ'য়ে যাবে। কিন্তু নিন্দা জিনিশটি (অন্তত আমাদের এই বাংলাদেশে) সমাজে সীমেণ্টের মতো কাজ করে; পাঁচিশজন একসঙ্গে থাকলেও

বিদ্যুদ্বেগে একমত হ'য়ে যায়, প্রত্যেকে অন্য প্রত্যেকের নিবিড় বন্ধু হ'য়ে ওঠে, পরস্পরকে সমর্থন করার উৎসাহে নিজেদের মধ্যে অনেক হিংসাদ্বেষ তখনকার মতো ভুলে যায়। সেটা কি একটা কম কথা? যে-মানুষ আমাদেরই বন্ধু, যে নিজের অসুবিধে ক'রেও নানাভাবে আমাদের সাহায্য করেছে, সবাই গলা মিলিয়ে (ও মন মিলিয়ে) যদি তারই কেচ্ছা দু-ঘণ্টা ধ'রে করা যায়, রবিবারের সকালবেলাটি কাটাবার পক্ষে তার চেয়ে রমণীয় উপায় আর কী হ'তে পারে?

কিংবা হয়তো উপকারীকে মানুষ ক্ষমা করতে পারে না, নিন্দার দ্বারা সেই ঋণ শোধ করে।

কিন্তু 'উপকার', 'ঋণ'—এ-সব কথা ওঠেই বা কিসে। বিদ্যাপীঠ থেকে মাইনে পাচ্ছেন, বাড়ি পাচ্ছেন (হঠাৎ এটা যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করলে সবাই), আমাদের চিকিৎসা করাই তাঁর ডিউটি নয় কি? ইংরেজি 'ডিউটি' কথাটা ব্যবহৃত হ'তে শুনলাম, যেন তার অর্থ বাংলা 'কর্তব্যে'র চাইতে বেশি কিছু। হ্যাঁ—কখনো-কখনো ওষুধ-টষুধও দিয়েছেন বটে (এ-কথা যিনি বললেন, আমি জানি তাঁর ছেলের অসুখের সময় ডাক্তার মুখার্জি বারোটা ইনজেকশন জুগিয়েছিলেন; বলেছিলেন, 'পরে সুবিধেমতো দাম দেবেন'—কিন্তু তিনি তা ভুলে গিয়েছিলেন আর ডাক্তারও আর মনে করিয়ে দেননি)—কিন্তু বিদ্যাপীঠের ডিসপেনসারিতে তো কত রকম ওষুধই থাকে, আর তার হিশেবপত্রেরও তো তিনিই মালিক। আর পরের খরচে দয়া দেখাতে কার না ভালো লাগে, বলুন! এখন কথা হচ্ছে, গোবিন্দবাবুর নাতির বিষয়ে উনি যে ধাপ্পা দিচ্ছেন না তারই বা বিশ্বাস কী। কামড়ে ছিঁড়ে দিলে শিশুটাকে, গলগল ক'রে আধ সের রক্ত বেরোলো—আর উনি বলছেন কিনা কিছু হয়নি! জলাতঙ্ক একবার হ'লে আর কি রক্ষে আছে যে উনি ও সব টালবাহানা করছেন! শেষটায় না প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয় ছেলেটার।

হারামণি যেদিন ভোম্বলকে কামড়ালে সেদিন মঙ্গলবার ছিলো। বেস্পতিবার সকালে গোবিন্দবাবু ক্লাশে এলেন না, মেয়েকে আর নাতিকে নিয়ে সাইকেল-রিকশ ক'রে রেল-স্টেশনের দিকে চললেন। পাশে-পাশে সাইকেল নিয়ে চললেন বেণীমাধব। স্টেশনের কাছে একজন এম. বি. ডাক্তার থাকেন, তাঁরও বেশ নাম-ডাক এ অঞ্চলে। তিনি ভোম্বলকে দেখে একটা ওষুধ দিলেন বটে, কিন্তু যা বললেন তাতে ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে কোনো তফাৎ হ'লো না। বিকেলের ট্রেনে তাঁরা চ'লে গেলেন আসানসোল, সেখানকার সব চাইতে নামজাদা ডাক্তারকে দেখানো হ'লো। তিনি অন্য তুটো ওষুধ দিলেন, কিন্তু মোটের উপর একমতই হ'লেন মুখার্জির সঙ্গে। জলাতঙ্কের আশু আশঙ্কার কথা কেউই বলেন না। (এ-সব খবর আমি পরে জেনেছিলাম।)

শুক্রবার থেকে ভোম্বল তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও আনন্দ ফিরে পেলে; এদিকে হারামণিরও তখন পর্যন্ত কোনো বিকারের লক্ষণ দেখা গেলো না। গুপ্ত সাহেবের সঙ্গে বেড়িয়ে, মিসেস মুখার্জির হাতে খেয়ে, আর যখন-তখন নাতালীর আদর ভোগ ক'রে, দিনের মধ্যে ঘণ্টাকয়েক দাপাদাপি ছুটোছুটি ক'রে আর বাকিটা সময় অর্ধ-ঘুমন্ত বিশ্রামের মধ্যে কাটিয়ে দিয়ে—তেমনি পরম ও অচেতন অস্তিত্বসুখে ডুবে রইলো হারামণি। ভোম্বলের মতোই সে যেন ধ'রেই নিয়েছে যে অন্য সকলের কাজ হচ্ছে তাকে ভালোবাসা ও সেবা করা; শুধু বেঁচে আছে ব'লেই সে সুখে আছে। শীত কেটে গিয়ে দক্ষিণে হাওয়া দিচ্ছে ততদিনে, অ্যাভেনিউর তুই দিক কৃষ্ণচূড়ায় লাল হ'য়ে উঠলো।

শুক্রবার বিকেলের দিকে ডাক্তার মুখার্জি একটু অসুস্থ বোধ করলেন।

চারটের সময় অভিজিৎকে ডেকে পাঠালেন তিনি। অভিজিতের মনের অবস্থা তখন ভালো ছিলো না।

সকালের ক্লাশের পর থেকেই একটু অন্যমনস্ক দেখছিলাম তাকে। খেতে ব'সেও (ছুপুরবেলায় আমার সঙ্গেই খায় সে) চুপচাপ ছিলো। ছুটোর সময় তার একটা ক্লাশ ছিলো, তিনটের পরে যখন ফিরে এলো আমি চা তৈরি করিয়ে তাকে কথাবার্তায় টানার চেষ্টা করলাম।

'কী ব্যাপার ? তোমার কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে ?'

'না, তেমন কিছু না।'

'তার মানে, অল্প কিছু হয়েছে ?'

আর-একটু পিড়াপিড়ি করার পর সে কবুল করলে যে আজকের ডাকে একখানা চিঠি আশা করেছিলো, সে-চিঠি আসেনি।

'আসেনি তো কী হয়েছে ? কাল আসবে হয়তো।'

'না, আজই আসার কথা।'

'ঠিক আজই ?'

অভিজিৎ এমনভাবে চুপ ক'রে রইলো যে আমার মনে হ'লো ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছি। জিগেস করলাম, 'মালতীর চিঠি ?'

অভিজিৎ মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো।

'মালতী চিঠি লেখে তোমাকে ?'

'সপ্তাহে একটা ক'রে চিঠি পাই।

'ডাকে পাঠায় ?'

'তাছাড়া আর কী-ভাবে পাঠাবে ?···আমি জবাবও লিখি।'

'জবাবও লেখো ? কিন্তু শ্রীমতীতে মেয়েদের চিঠিপত্র সব খোলা হয়, শুনেছি।'

'রোববারে ও যখন চ'লে যায় এখান থেকে—ওর হাতে দিই,' ব'লে অভিজিৎ একটু লাল হ'লো।

'ছেলেমানুষি!'—কথাটা বলতে গিয়েও আমি থেমে গেলাম। আমি অভিজিতেরই সমবয়সী যুবক, আমাকে কি মানায় জীবনের এই সবচেয়ে সুন্দর খেলাকে পরিহাস করা? আর, পাঠক, আপনিও মুখে কৌতুকের রেখা ফেলবেন না—হোক আপনার বয়স চল্লিশ বা পঞ্চাশ পার, একবার আপনার হৃদয় যদি বাণবিদ্ধ হয় তাহ'লে আপনিও কি অর্ধেক দিন একসঙ্গে কাটাবার পরে বাড়ি ফিরেই টেলিফোন তুলবেন না, টেলিফোন নামিয়ে রেখেই লিখতে বসবেন না চিঠি, আর নিশীথরাত্রে রাস্তায় বেরিয়ে নিজের হাতে চিঠি ডাকে ফেলে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকবেন না টেলিফোনের আওয়াজের জন্য? জীবনে একবারও কি এ-রকম হয়নি আপনার? আপনি এতই ভাগ্যবান—বা দুর্ভাগা?

'হয়তো লিখতে পারেনি কোনো কারণে। বা ডাকে দেরি হচ্ছে।'

'ঐ ডাকের গোলমালটাকেই তো ভয়,' গম্ভীর গলায় জবাব দিলো অভিজিৎ।

তার কথা শুনে আমারও মনটা দ'মে গেলো। এর কিছুদিন আগে থেকেই আমাদের কী-রকম একটা আবছা ধারণা হচ্ছিলো যে বিদ্যাপীঠের কোনো-কোনো ব্যক্তির চিঠিপত্র ঠিকমতো পৌঁচচ্ছে না। গুপ্ত-সাহেব হৈ-চৈ ক'রে দু-তিনবার নালিশও করেছিলেন পোস্টাপিশে, আমিও মনে-মনে অস্বস্তিতে ছিলাম—যদিও তখন পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝিনি যে ডাকঘর আর আমাদের মধ্যে সত্যি কোনো 'তৃতীয় ব্যক্তি' প্রবেশ করেছে।

'তা ব্যাপারটা কী, মালতী এলেই তো জানতে পারবে। ভেবো না।'

আমার কথায় অভিজিৎ বিশেষ আশ্বস্ত হ'লো ব'লে মনে হ'লো না।

একটু পরেই তার বাড়ি থেকে খবর এলো। সে যাওয়ামাত্র তার বাবা বললেন, 'আমি আজ আর বেরোবো না, অভি—এই চিঠিটা নিয়ে যাও। মালতীকে নিয়ে এসো।' ড্রাইভারকে সঙ্গে দিতে ভুললেন না তিনি, পাছে সুভদ্রা দেবী একা অভিজিতের সঙ্গে মালতীকে আসতে না দেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যে অভিজিৎ ফিরে এলো, কিন্তু মালতী এলো না। ডাক্তার মুখার্জির সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে মালতীকে হস্টেল থেকে বেরোতে দেবার অনুমতি নেই। অপমানিত বোধ করলেন ডাক্তার, আর গুপ্ত-সাহেব রাগে লাল হ'য়ে টেলিফোন তুললেন। কিন্তু বার-বার চেষ্টা ক'রেও সুভদ্রা দেবীকে পাওয়া গেলো না। তিনি 'ব্যস্ত আছেন'।

আমাদের সবচেয়ে প্রিয় এই শুক্রবারের সন্ধেটা ভারি বিশ্রী কাটলো সেদিন। অভিজিৎ রীতিমতো মুষড়ে পড়লো—শুধু মালতীর অনুপস্থিতির জন্য নয়—তার মনে যেন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে চিঠি চুরি গেছে।

পরের দিন সকালে ডাক্তারই গেলেন মালতীকে আনতে, আর অভিজিৎ জানতে পারলে যে মালতী নির্দিষ্ট দিনে চিঠি লিখতে ভোলেনি।

মালতী এলো, কিন্তু কারোরই তেমন আনন্দ যেন নেই আর। হয়তো মালতীকে আনতে গিয়ে সুভদ্রা দেবীর সঙ্গে ডাক্তার মুখার্জির কিছু কথাবার্তা বা কথা-কাটাকাটি হয়েছিলো; পাছে কিছু বলতে গেলেই সে-সব বেরিয়ে পড়ে, আর সকলেরই আরো বেশি মন-খারাপ হ'য়ে যায়, তাই তিনি কথা খুব কম বলছেন। গুপ্ত-সাহেব একটা খাঁচায় পোরা বৃদ্ধ বাঘের মতো রাগে গরগর করছেন মাঝে-মাঝে; সেই রাগের লক্ষ্য কে তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মিসেস মুখার্জি আর নাতালীর চেষ্টায় লক্ষণীয় কোনো উজ্জীবন সাধিত হ'লো না—

বাড়ির সবাই সকাল-সকাল শুতে গেলেন সেদিন, অভিজিৎ আর আমি আমাদের আস্তানায় ফিরলাম।

ডাক্তারের বাড়িটি দোতলা; একতলার একটি বড়ো ঘরে (অভিজিতের ছিলো সেটা) গুপ্ত-সাহেব থাকেন। দোতলায় নাতালী যেটাতে শোয়, সে-ঘরটি ছোটো, টায়ে-টুয়ে একজন মাত্র থাকতে পারে। শুক্রবারে মালতী এলে তাই ব্যবস্থা বদলাতে হয়; গুপ্ত সাহেব ড্রয়িংরুমের একটা আসবাবকেই শয্যায় পরিণত ক'রে নেন, আর তাঁর ঘর দখল ক'রে নেয় মালতী আর নাতালী। নাতালীর সংসর্গ ভিন্ন হারামণির রাত কাটে না; সেও সে-দু'রাত ও ঘরেই থাকে।

কিন্তু সেই শনিবার রাত্রে বড্ড বেশি চ্যাঁচামেচি করছিলো হারামণি। যারা নিচে শুয়েছে সেই তিন জনেরই ঘুম ভেঙে যাচ্ছিলো মাঝে-মাঝে। অবশেষে—রাত তখন চারটে নাগাদ—হারামণি এত বেশি অশান্ত হ'য়ে উঠলো, গর্জন ক'রে এমনভাবে বার-বার ছুটে যেতে লাগলো দরজার দিকে, যে দরজা খুলে বেরিয়ে না-এসে উপায় থাকলো না। নাতালীর পিছন-পিছন মালতীও উঠে এলো; এসে দেখলে, গুপ্ত-সাহেব ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে বারান্দায়।

'কী ব্যাপার হারামণির?'

'কী জানি। চোর-টোর এসেছে বোধহয় কাছাকাছি।'

যে-মুহূর্তে দরজা খোলা পাওয়া, হারামণি পাগলের মতো ছুটে গেলো কম্পাউণ্ডের গেটের দিকে; চারদিকের মেহেদির বেড়া পর্যন্ত ঘুরে এলো দু-তিনবার, তারপর তাকে দেখা গেলো (গুপ্ত-সাহেব লক্ষ করেছিলেন এটা) ছোট্ট ব্রাউন রঙের বলের মতো একটা জিনিশ মুখে নিয়ে ফিরে আসতে। বারান্দায় উঠে সেই গোলাটা সে কপ ক'রে খেয়ে ফেললে।

তারপর—এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা পরে হবে, বাইরে তখন ফর্শা হ'য়ে আসছে—উদ্‌ভ্রান্তের মতো বারান্দায় বেরিয়ে এলো মালতী।

বিস্রস্ত চুল, আঁচল খ'সে পড়েছে গা থেকে, যেন মাতালের মতো ট'লে-ট'লে চলছে। এই সময়েই দৈবাৎ (বা চেষ্টা ক'রে) কোনো প্রাতঃভ্রমণকারী রাস্তা থেকে তাকে দেখে ফেলেছিলো; আর এটাই পরে জোরালো একটা প্রমাণ হ'য়ে দাঁড়ালো মালতীর আর প্রোফেসর গুপ্তর বিরুদ্ধে। সকলেই জানে যে ও-ঘরটাতে গুপ্ত-সাহেব থাকেন, আর যদি শেষরাত্রে বিস্রস্ত বসনে মালতীকে সেই ঘর থেকে বেরোতে দেখা যায়, তাহ'লে দুয়ে-দুয়ে চার যোগ ক'রে নিতে বুদ্ধিমানের আর কতটুকু সময় লাগে? আর যদি মনে রাখা যায় গুপ্তর প্রতি নাতালীর দুর্বলতা আর মালতী ও অভিজিতের প্রণয়সম্বন্ধ, তাহ'লে সব মিলিয়ে ছবিটা কী-রকম লোমহর্ষক হ'য়ে ওঠে তা আমি পাঠকের কল্পনার উপরে ছেড়ে দিতে চাই।

এদিকে, ততক্ষণে, অভিজিৎকে লেখা বিখ্যাত প্রেমপত্রটি মজুমদার মশায়ের দপ্তরে পৌঁছে গেছে; হাতছাড়া করার আগে ছেলেরা নাকি নকল ক'রে নিয়েছিলো, কলকাতায় গিয়ে বন্ধুদের 'আমাকে লেখা' ব'লে দেখাবার জন্য।

লিপস্টিক-সংক্রান্ত আইন-প্রণয়নের প্রয়োজন হ'লো না; প্রোফেসর গুপ্তর বেশ কিছুটা আগেই মালতীকে বিদায় নিতে হ'লো মুক্তিগ্রাম থেকে।

টলতে-টলতে দোতলায় উঠলো মালতী। মিসেস মুখার্জি তখনো বিছানা ছাড়েননি ; তাঁর গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে মালতী কেঁদে উঠলো, 'কাকিমা, শিগগির নিচে যান।'

'কী? কী হয়েছে?'

'হারামণি—হারামণি—' মালতী কথা শেষ করতে পারলে না।

দু-মিনিটের মধ্যে বাড়ির সবাই জড়ো হ'লো নিচে ; চাকরের মুখে খবর পেয়ে অভিজিৎ আর আমি ছুটে এলাম। ঘরের মেঝেতে হারামণি প'ড়ে আছে ; মুখ হাঁ-করা, জিভ আর দাঁতের পাটি কুৎসিত-ভাবে বেরিয়ে পড়েছে, পেটটি ফুলে উঠেছে এরই মধ্যে। ছটফট ক'রে শূন্যে আঁচড় কাটছিলো, দুটি পা এখনো শূন্যে তোলা।

দেখে আমার চোখে জল এলো।

অনেকটা লালা প'ড়ে ছিলো মেঝেতে, তার মধ্যে ছোট্ট একটা কালচেমতো কিছু। ডাক্তার আমাদের সকলকে সরিয়ে দিয়ে চামচে দিয়ে সেগুলো একটা কাচের শিশিতে তুললেন। ড্রাইভার দিয়ে তক্ষুনি পাঠিয়ে দিলেন আসানসোলে, রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য। দু-ঘণ্টা পরে রিপোর্ট এলো : বিষ পাওয়া গেছে।

দশটা নাগাদ সান্ত্বনাদাতার দল এলেন। ইংরেজি বাংলায় বিস্তারিত খেদপ্রকাশের পর একজন বললেন : 'কিন্তু কুকুরটা মরলো কী ক'রে?'

'মরেনি,' গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন ডাক্তার মুখার্জি, 'মেরে ফেলা হয়েছে। বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'বিষ খাইয়ে?

ডাক্তার ল্যাবরেটির রিপোর্টের কথা বললেন।

'অন্য কিছু নয় তো?' হঠাৎ জিগেস করলেন বেণীমাধববাবু।

ডাক্তার আবার বললেন, 'লালা পরীক্ষা ক'রে বিষ পাওয়া গেছে।'

'কিন্তু কী-রকমের বিষ?' প্রশ্ন করলেন অন্য একজন; কে তিনি তা আমার ঠিক মনে নেই। 'এই যে গোবিন্দবাবু এখানে আছেন, এঁর নাতিকে এই কুকুরই কামড়ে দিয়েছিলো আজ সাতদিনও হয়নি। আমরা ডাক্তার মুখার্জির কথায় অবিশ্বাস করছি না, কিন্তু আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে চাই যে কুকুরটা র‍্যাবিড হ'য়ে মরেনি।'

'ঠিক কথা! একটি মানবশিশুর জীবনমরণ নির্ভর করছে এর উপর।'

'আমরা লাশ নিয়ে যাবো। নিজেরা পরীক্ষা করাবো।'

'খবরদার!' লাফিয়ে উঠলেন গুপ্ত-সাহেব, 'ওর গায়ে হাত দেবেন না কেউ।'

অনেকক্ষণ বচসা হ'লো, গুপ্ত উত্তেজিত হ'য়ে নিজের মাথার চুল ছিঁড়লেন, কিন্তু ততক্ষণে পনেরো-কুড়িটি ছাত্রও জড়ো হয়েছে সেখানে, জনতার বিরুদ্ধে কিছুই করা গেলো না। দড়ি দিয়ে চার পা বেঁধে কয়েকটি জোয়ান ছেলে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলো আমাদের হারামণিকে। দূরে নিয়ে গিয়ে মৃতদেহটাকে আচ্ছা ক'রে লাঠিপেটা করলে, তারপর চ্যাংদোলা ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলে শকুনের ভাগাড়ে। দুপুরে খেতে ব'সে তারা বুঝলে, দৈহিক ব্যায়াম খিদের পক্ষে কত বড়ো সহায়ক।

হারামণিকে যখন ওরা নিয়ে গেলো, তখন নাতালী যে-রকম আর্তস্বরে কেঁদেছিলো তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা ক'রে আমি আমার অক্ষম লেখনীকে পীড়িত করবো না।

সন্ধেবেলা টীচার্স ক্লাবের দরজা দিয়ে লম্বা পা ফেলে প্রোফেসর গুপ্ত ঢুকলেন। শাদা চুল, গায়ের জামা টকটকে লাল, হাতে সেই

শক্ত মোটা লাঠিটা। চোখ ঘোলাটে দেখাচ্ছে, নাকটা আরো তীক্ষ্ণ। বড়ো ঘরে জন পনেরো শিক্ষক ছড়িয়ে আছেন। বেণীমাধববাবু পিংপং খেলছিলেন, সোজা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গুপ্ত চীৎকার ক'রে বললেন, 'হারামণিকে কে বিষ খাইয়েছিলো?'

'অ্যাঁ! কী বলছেন?'

'কে বিষ খাইয়েছিলো হারামণিকে? বলুন!'

'আমি—আমি তো জানি না!'

'বলুন! বলতেই হবে আপনাকে! আর আপনিই যদি ও-কাজ ক'রে থাকেন তাও বলুন। তাকে দেখে নেবো আমি। তার হাত-পা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে পঞ্চাশটা কুকুর ডেকে খাওয়াবো। বলুন!' ব'লে সজোরে লাঠি ঠুকলেন মেঝেতে।

'মেরে ফেললে! মেরে ফেললে!' পিংপং র‍্যাকেট দিয়ে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠলেন বেণীমাধব। সঙ্গে-সঙ্গে সবাই ছুটে এসে ঘিরে ফেললে গুপ্তকে। 'ধরুন! ধ'রে ফেলুন! সাবধান—কাছে যাবেন না। He is dangerous! He is drunk! How atrocious! We must bring this matter before—' এই রকম মন্তব্য-বর্ষণের মধ্য দিয়ে বেগে বেরিয়ে এলেন গুপ্ত-সাহেব। দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার বললেন, 'পঞ্চাশটা কুকুর ডেকে খাওয়াবো। পঞ্চাশটা!' তাঁর মাথার তখন ঠিক ছিলো না।

পরের দিনই অধ্যাপক-মণ্ডলের এক সভা বসলো। প্রায় ফুল্-সেশন সভা; অভিজিৎ, বটব্যাল আর আমি ছাড়া প্রত্যেকেই উপস্থিত ছিলেন। যে-কাগজটি প্রিন্সিপাল, সেক্রেটারি আর প্রেসিডেণ্টকে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো তাতে থাকলো গুপ্তর বিষয়ে একটি 'vote of censure', শাদা বাংলায় তার অপসারণের জন্য আবেদন। সেটাকে বিবেচনা করার জন্য কুড়ি দিন পরে সেক্রেটারি কর্তাব্যক্তিদের এক সভা ডাকলেন।

কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যে অন্য একটি ঘটনা ঘ'টে গেলো, তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা দেবার প্রয়োজন নেই—বর্ণনা আমার আসেও না।

ইতিমধ্যে অবশ্য গুপ্তর সঙ্গে বেণীমাধবের দেখাশোনা হয়েছে। 'সেদিন বড্ড ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম আপনাকে, কিছু মনে করবেন না। আমি রাগি মানুষ—।' 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' তক্ষুনি জবাব দিয়েছেন বেণীমাধব, 'রাগবার কারণ আপনার আছে বইকি, যথেষ্ট আছে। আহা, ও-রকম একটা সুন্দর কুকুর—আর কত ভালো-বাসতেন আপনারা, মেয়েরা তো কোল থেকে নামাতেন না। কী একটা বিশ্রী ব্যাপারই হ'য়ে গেলো!' 'কিন্তু বিষটা খাওয়ালো কে জানেন?' 'আমিও তো তা-ই ভাবছি। কী জানেন, এই মুক্তিগ্রামের আবহাওয়াই বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে—আমরা যে বেঁচে আছি তা-ই আশ্চর্য!'

এর পরে দেখা গেলো, গুপ্তর সঙ্গে দেখা হ'লেই অনেকখানি নিচু হ'য়ে নমস্কার করেন বেণীমাধব, হেসে-হেসে অনেক কথা বলেন। ঐ 'vote of censure'-এর ব্যাপারটা যে ফাঁকা আওয়াজমাত্র, কর্তৃপক্ষ যে ওটার উপযুক্ত স্থান হিশেবে বাজে কাগজের ঝুড়িটাকে নির্দেশ করবেন, সে-বিষয়েও তাঁর প্রত্যয় প্রকাশ করতে ত্রুটি করলেন না বেণীমাধব। কোনো-কোনো শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি আশা করেছিলেন গোলমালটা বুঝি 'মিটমাট' হ'য়ে গেলো, কিন্তু বটব্যাল প্রথম থেকেই অন্য রকম আশঙ্কা করেছিলেন। একটা কুৎসিত গুজব ফিশফিশ ক'রে আমার কানে বলেছিলেন তিনি। আমি বিশ্বাস করিনি—করতে চাইনি, তবু একদিন দুর্বল মুহূর্তে গুপ্ত-সাহেবকে ব'লে ফেলেছিলাম। তিনি হেসে উঠে বলেছিলেন, 'মারবে আমাকে? মারুক না!' ব'লে মাটিতে লাঠি ঠুকেছিলেন।

সেই রাত্রে ছিলো বৈশাখ মাস, সুন্দর রাত ছিলো। আকাশ

ঝকঝক করছে তারায়, মুক্তিগ্রামের প্রান্তরের উপর দিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো হাওয়া গড়িয়ে যাচ্ছে, ঝোপঝাড়ের কাছে এলে সুগন্ধ পাওয়া যায়। শনিবার ; অভিজিৎ কলকাতায় ; মালতী চ'লে যাবার পরে নিয়মটা একটু বদলেছে, প্রতি শুক্রবার অভিজিৎই যায় কলকাতায়, ওদের দু-জনের অভাবের জন্য মুখার্জি-বাড়িতে আড্ডা আর জমে না। এক মরণাপন্ন রোগীর জন্য ডাক্তার মুখার্জিকেও যেতে হয়েছে টাটানগরে, ফিরতে দিন দুই দেরি হবে।

বিতর্ক-প্রতিযোগিতা ছিলো ছেলেদের। বছরে চার-পাঁচ বার হয় এটা ; এর আগে দু-বার প্রোফেসর গুপ্ত আসেননি; এবার বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ ক'রে তাঁকে অন্যতম বিচারকরূপে আনানো হয়েছে। বিশেষ নিমন্ত্রণের কারণ—কেউ-কেউ বলেন—অধ্যাপক-মণ্ডলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করার জন্য লজ্জাপ্রকাশ। উত্তেজনার মুহূর্তে ও-রকম কতই হ'য়ে থাকে ; গুপ্ত-সাহেবও তো মোটা লাঠি ঠুকে 'পঞ্চাশ কুত্তা দিয়ে খাওয়াতে' চেয়েছিলেন। আমি—হয়তো ঐ সুন্দর বৈশাখী রাত্রির প্রভাবে—আমি মনে-মনে একটু সুখবোধ করছিলাম সেই রাত্রে, যা-কিছু হ'য়ে গেছে তা ভুলে যাবার জন্যই যেন প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর ডীবেটিং ক্লাব বিতর্ককারী ও উপস্থিত অধ্যাপকদের চা খাওয়ালেন ; তার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্পগুজব চললো ; ভিড় ক্রমে পাৎলা হ'য়ে এলেও কয়েকজনকে দেখা গেলো গুপ্ত-সাহেবকে ঘিরে তাঁর কথাবার্তা শুনছেন। রাত দশটায় আমরা শেষ কয়েকজন বেরোলাম : গুপ্ত-সাহেব, বেণীমাধব, বটব্যাল আর আমি। মিনিট পাঁচেক পরেই বটব্যালকে আর আমাকে আলাদা হ'তে হলো। এক মিনিট পরে বটব্যাল বললেন, 'আপনি ওঁদের সঙ্গে গেলে পারতেন।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'আধ ঘণ্টা পরে ঘুমোলে কিছু হবে না। যান ওদের সঙ্গে।'

'নাঃ—!' বেণীমাধবের সঙ্গ আর ভালো লাগছিলো না আমার; গুপ্ত-সাহেবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুতার ভাবটাও ভালো লাগছিলো না।

কিন্তু, ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত এসে হঠাৎ কী মনে হ'লো, আস্তে-আস্তে ফিরে গেলাম। ক্রমে একটু দ্রুত হ'লো চলন, যেন একটা উদ্বেগ নিয়ে চলেছি। বটব্যালের মুখে, কথার ধরনে, কিছু একটা ছিলো, যাতে আমার কিছুক্ষণ আগেকার সুখের ভাবটা উবে গিয়েছিলো। যখন সেই মাঠে এসে পড়েছি, যার মধ্য দিয়ে সংক্ষেপে মুখার্জিদের বাড়িতে চ'লে যাওয়া যায়, হঠাৎ কয়েকটা শাদা-শাদা মূর্তিকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যেতে দেখলাম। আমি কিছু না-ভেবে অন্ধের মতো ছুটলাম তাদের পিছনে, কিন্তু ততক্ষণে তারা ধ'রে ফেলেছে গুপ্তকে।

'Scoundrel!' 'বদমায়েসির আর জায়গা পাও না!' 'You swine!' 'You bloody son of a bitch!'

দু-জনে দু-দিক থেকে তাঁর হাত ধ'রে ফেললো, আরেকজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড দুই চড় বসিয়ে দিলে তাঁর দু গালে। একটু দূরে আরো কয়েকজন গোল হ'য়ে ঘিরে দাঁড়ালো পাহারা দিতে; নবেন্দু গুপ্তর লাঠিটাকে তীরের মতো উড়ে যেতে দেখলাম। বেশ মাপাজোকা-ভাবেই আরম্ভ হয়েছিলো, যেন কোনো নাচ শুরু হচ্ছে, কিন্তু একটু পরেই ছন্দ কেটে গেলো, শুরু হ'লো এলোপাথাড়ি কিল, চড়, ঘুষি। পাগলের মতো।

হয়তো ঠিক এ রকমভাবে ঘটেনি, হয়তো অন্ধকারে দেখতে আমার কিছু ভুল হ'য়ে থাকবে, কিন্তু খুঁটিনাটিতে কিছু ভুল হ'লেও এ-ব্যাপারে কিছু এসে যায় না।—এ-পর্যন্ত যেন মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে দেখছিলাম আমি, কিন্তু হঠাৎ ছুটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, যারা পাহারায় ছিলো তারা সজোরে চেপে ধরলে আমাকে, তাদের হাত ছিটকে বেরিয়ে আসতেই দু-দিক থেকে দুই প্রচণ্ড ঘুষি

পড়লো আমার মুখের উপর, পায়ের তলায় মাটি যেন ট'লে উঠলো। এর পরে, কখন জান না, উন্মত্তের মতো মুখার্জির বাড়ির দিকে ছুটলাম আমি। দু-জন আমার পিছু নিলে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এক সময়ে দেখি, লোকজন মিলিয়ে গেছে, গুপ্ত প'ড়ে আছেন লম্বা হ'য়ে মাটির উপর, নাতালী তাঁর মাথার কাছে নিচু হ'য়ে এমনভাবে বিলাপ করছে যে মুহূর্তের জন্য আমার মনে হ'লো গুপ্তকে বুঝি শেষ ক'রেই রেখে গেছে ওরা।

আমরা কোনোরকমে ধরাধরি ক'রে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলাম। নাতালী ফার্স্ট এইড দিলে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলে, মিসেস মুখার্জি সারা রাত জেগে রইলেন শিয়রে। দু-জন মহিলাই কাঁদলেন, নাতালীর চোখ কেঁদে-কেঁদে ফুলে গেলো।

পরের দিন অ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হ'লো আসানসোলের হাসপাতালে। নাতালী রইলো সঙ্গে: তার স্বামীর স্মৃতিজড়িত সেই হাসপাতালে যতক্ষণ সম্ভব সে কাটিয়ে দেয় প্রতিদিন, তাকে সেখান থেকে সরাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় ডাক্তারদের। গুপ্তর পুরো সেরে উঠতে মাসখানেক লাগলো। তারপর গ্রীষ্মের ছুটি। আমরা কয়েকজন তাঁকে হাওড়া স্টেশনে বম্বে মেল-এ তুলে দিলাম। স্টেশনে নাতালী ছিল না; কেননা ততদিনে তার আবার মাথা-খারাপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, ডাক্তার মুখার্জি তাকে ঘরে আটকেছেন। গ্রীষ্মের ছুটির পরে চিন্তামণি দত্ত আর বিদ্যাপীঠে ফিরলেন না। অভিজিৎও না।

আর সবই বুঝতে পেরেছি, সহ্যও করতে পেরেছি হয়তো; শুধু একটা কথা ভেবে অস্থির লাগছে এই মুহূর্তে, বিচলিত না-হ'য়ে পারছি না। মালতী কি সত্যি বিয়ে করবে বেণীমাধবকে? মনে হয় তা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু—কে জানে।